স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

ধর্ম-সমীক্ষা

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

১. ধর্ম কি 2
২. ধর্মের প্রয়োজন 15
৩. যুক্তি ও ধর্ম 28
৪. বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ 46
৫. বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায় 71
৬. আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম 90
৭. বৈদিক ধর্মাদর্শ 103
৮. হিন্দুধর্ম 118

১. ধর্ম কি

রেল-লাইনের উপর দিয়া একখানা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন সশব্দে চলিয়াছে; একটি ক্ষুদ্র কীট লাইনের উপর দিয়া চলিতেছিল, গাড়ী আসিতেছে জানিতে পারিয়া সে আস্তে আস্তে রেল-লাইন হইতে সরিয়া গিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইল। যদিও ঐ ক্ষুদ্র কীটটি এতই নগণ্য যে, গাড়ীর চাপে যে-কোন মুহূর্তে নিষ্পেষিত হইতে পারে, তথাপি সে একটা জীব—প্রাণবান্ বস্তু; আর এত বৃহৎ, এত প্রকাণ্ড ইঞ্জিনটি একটা যন্ত্র মাত্র। আপনারা বলিবেন, একটির জীবন আছে, আর একটি জীবনহীন জড়মাত্র—উহার শক্তি, গতি ও বেগ যতই প্রবল হউক না কেন, উহা প্রাণহীন জড় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ঐ ক্ষুদ্র কীটটি যে লাইনের উপর দিয়া চলিতেছিল এবং ইঞ্জিনের স্পর্শমাত্রেই যাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইত, সে ঐ প্রকাণ্ড রেলগাড়ীটির তুলনায় মহিমাসম্পন্ন। উহা যে সেই অনন্ত ঈশ্বরেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং সেইজন্য এই শক্তিশালী ইঞ্জিন অপেক্ষাও মহৎ। কেন উহার এই মহত্ত্ব হইল? জড় ও প্রাণীর পার্থক্য আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি? যন্ত্রকর্তা যন্ত্রটি যেরূপে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিয়া নির্মাণ করিয়াছিল, যন্ত্র সেইটুকু কার্যই সম্পাদন করে, যন্ত্রের কার্যগুলি জীবন্ত প্রাণীর কার্যের মত নয়। তবে জীবন্ত ও প্রাণহীনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপে করা যাইবে? জীবিত প্রাণীর স্বাধীনতা আছে, জ্ঞান আছে আর মৃত জড়বস্তু কতকগুলি নিয়মের গণ্ডীতে বদ্ধ এবং তাহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহার জ্ঞান নাই। যে-স্বাধীনতা থাকায় যন্ত্র হইতে আমাদের বিশেষত্ব—সেই মুক্তি-লাভের জন্যই আমরা সকলে চেষ্টা করিতেছি। অধিকতর মুক্ত হওয়াই আমাদের সকল চেষ্টার উদ্দেশ্য, কারণ শুধু পূর্ণ মুক্তিতেই পূর্ণত্ব লাভ হইতে পারে। আমরা জানি বা না জানি, মুক্তিলাভ করিবার এই চেষ্টাই সর্বপ্রকার উপাসনা-প্রণালীর ভিত্তি।

জগতে যত প্রকার উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আছে, সেইগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অতি অসভ্যজাতিরা ভূত, প্রেত ও পূর্বপুরুষদের আত্মার উপাসনা করিয়া থাকে। সর্পপূজা, পূর্বপুরুষদিগের আত্মার উপাসনা, উপজাতীয় দেবগণের উপাসনা—এগুলি লোকে কেন করিয়া থাকে? কারণ লোকে অনুভব করে যে, কোন অজ্ঞাত উপায়ে এই দেবগণ ও

পূর্বপুরুষেরা তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা অনেক বড়, বেশী শক্তিশালী এবং তাহাদের স্বাধীনতা সীমিত করিতেছেন। সুতরাং অসভ্যজাতিরা এই-সকল দেবতা ও পূর্বপুরুষকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাঁহারা তাহাদের কোন উৎপীড়ন না করিতে পারেন অর্থাৎ যাহাতে তাহারা অধিকতর স্বাধীনতালাভ করিতে পারে। তাহারা ঐ-সকল দেবতা ও পূর্বপুরুষের পূজা করিয়া তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে প্রয়াসী এবং যে-সকল বস্তু মানুষের নিজের পুরুষকারের দ্বারা উপার্জন করা উচিত, সেগুলি ঈশ্বরের বরস্বরূপ পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। মোটের উপর এই-সকল উপাসনা-প্রণালী আলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সমগ্র জগৎ একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আশা করিতেছে। এই আশা আমাদিগকে কখনই একেবারে পরিত্যাগ করে না, আর আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা সকলেই অদ্ভুত ও অসাধারণ ব্যাপারগুলির দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছি। জীবনের অর্থ ও রহস্যের অবিরাম অনুসন্ধান ছাড়া মন বলিতে আর কি বুঝায়? আমরা বলিতে পারি, অশিক্ষিত লোকেরাই এই আজগুবির অনুসন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু তাহারাই বা কেন উহার অনুসন্ধান করিবে—এ প্রশ্ন তো আমরা সহজে এড়াইতে পারিব না। য়াহুদীরা অলৌকিক ঘটনা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। য়াহুদীদের মত সমগ্র জগৎই হাজার হাজার বর্ষ ধরিয়া এইরূপ অলৌকিক বস্তু দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। আবার দেখুন, জগতে সকলের ভিতরেই একটা অসন্তোষের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটা আদর্শ গ্রহণ করি, কিন্তু উহার দিকে তাড়াহুড়া করিয়া অগ্রসর হইয়া অর্ধপথ পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই নূতন আর একটা আদর্শ ধরিয়া বসিলাম। নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে যাইবার জন্য কঠোর চেষ্টা করি, কিন্তু তারপর বুঝিলাম, উহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। বারবার আমাদের এইরূপ অসন্তোষের ভাব আসিতেছে, কিন্তু যদি শুধু অসন্তোষই আসিতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের মনের কি অবস্থা হয়? এই সর্বজনীন অসন্তোষের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই—মুক্তিই মানুষের চিরন্তন লক্ষ্য। যতদিন না মানুষ এই মুক্তি লাভ করিতেছে, ততদিন সে মুক্তি খুঁজিবেই। তাহার সমগ্র জীবনই এই মুক্তিলাভের চেষ্টা মাত্র। শিশু জন্মিয়াই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। শিশুর প্রথম শব্দস্ফুরণ হইতেছে ক্রন্দন—যে-বন্ধনের মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ দেখে, তাহার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। মুক্তির

এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই ধারণা জন্মে যে, এমন একজন পুরুষ অবশ্যই আছেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্তস্বভাব। ঈশ্বর-ধারণাই মানুষের প্রকৃতির মূল উপাদান। বেদান্তে সচ্চিদানন্দই মানবমনের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণা। ঈশ্বর চিদ্ঘন ও স্বভাবতই আনন্দঘন। আমরা অনেকদিন ধরিয়া ঐ অন্তরের বাণীকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, নিয়ম বা বিধি অনুসরণ করিয়া মনুষ্যপ্রকৃতির স্ফূর্তিতে বাধা দিবার প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে আছে। আমরা ইহার অর্থ না বুঝিতে পারি, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আমাদের মানবীয় ভাবের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের, নিম্নস্তরের মনের সহিত উচ্চতর মনের সংগ্রাম চলিয়াছে এবং এই সংগ্রাম নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব—যাহাকে আমরা আমাদের আমিত্ব বা 'ব্যক্তিত্ব' বলি—রক্ষা করিবার একটা চেষ্টা।

এমন কি নরকও এই অদ্ভুত সত্য প্রকাশ করে যে, আমরা জন্ম হইতেই বিদ্রোহী। প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম সত্য—জীবনীশক্তির চিহ্ন এই যে, আমরা বিদ্রোহ করি এবং বলিয়া উঠি—'কোনরূপ নিয়ম মানিয়া আমরা চলিব না।' যতদিন আমরা প্রকৃতির নিয়মাবলী মানিয়া চলি, ততদিন আমরা যন্ত্রের মত—ততদিন জগৎপ্রবাহ নিজ গতিতে চলিতে থাকে, উহার শৃঙ্খল আমরা ভাঙিতে পারি না। নিয়মই মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া যায়। যখনই আমরা প্রকৃতির এই বন্ধন ভাঙিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করি, তখনই উচ্চস্তরের জীবনের প্রথম ইঙ্গিত বা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 'মুক্তি, অহো মুক্তি! মুক্তি, অহো মুক্তি!'—আত্মার অন্তস্তল হইতে এই সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে। বন্ধন—হায়, প্রকৃতির শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াই জীবনের অদৃষ্ট বা পরিণাম বলিয়া মনে হয়।

অতিপ্রাকৃত শক্তিলাভের জন্য সর্প ও ভূতপ্রেতের উপাসনা এবং বিভিন্ন ধর্মমত ও সাধন-প্রণালী থাকিবে কেন? বস্তুর সত্তা আছে, জীবন আছে—এ-কথা আমরা কেন বলি? এই-সব অনুসন্ধানের—জীবন বুঝিবার এবং সত্তা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে। ইহা অর্থহীন ও বৃথা হইতে পারে না। ইহা মানুষের মুক্তিলাভের নিরন্তর চেষ্টা। যে বিদ্যাকে আমরা এখন 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করি, তাহা সহস্র সহস্র বর্ষ যাবৎ মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং মানুষ এই মুক্তিই চায়। তথাপি প্রকৃতির ভিতর

তো মুক্তি নাই। ইহা নিয়ম—কেবল নিয়ম। তথাপি মুক্তির চেষ্টা চলিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সূর্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরমাণুটি পর্যন্ত সমুদয় প্রকৃতিই নিয়মাধীন—এমন কি মানুষেরও স্বাধীনতা নাই। কিন্তু আমরা এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা প্রথম হইতেই প্রকৃতির নিয়মাবলী আলোচনা করিয়া আসিতেছি, তথাপি আমরা উহা বিশ্বাস করিতে পারি না; শুধু তাহাই নয়, বিশ্বাস করিব না যে, মানুষ নিয়মের অধীন। আমাদের আত্মার অন্তস্তল হইতে প্রতিনিয়ত 'মুক্তি! মুক্তি!'—এই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। নিত্যমুক্ত সত্তারূপে ঈশ্বরের ধারণা করিলে মানুষ অনন্তকালের জন্য এই বন্ধনের মধ্যে শান্তি পাইতে পারে না। মানুষকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতেই হইবে, আর এ চেষ্টা যদি তাহার নিজের জন্য না হইত, তবে সে এই চেষ্টাকে এক অতি কঠোর ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। মানুষ নিজের দিকে তাকাইয়া বলিয়া থাকে, 'আমি জন্মাবধি ক্রীতদাস, আমি বদ্ধ; তাহা হইলেও এমন একজন পুরুষ আছেন, যিনি প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ নন—তিনি নিত্যমুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু।'

সুতরাং বন্ধনের ধারণা যেমন মনের অচ্ছেদ্য ও মূল অংশ, ঈশ্বরধারণাও তদ্রূপ প্রকৃতিগত ও অচ্ছেদ্য। এই মুক্তির ভাব হইতেই উভয়ের উদ্ভব। এই মুক্তির ভাব না থাকিলে উদ্ভিদের ভিতরেও জীবনীশক্তি থাকিতে পারে না। উদ্ভিদে অথবা কীটের ভিতর ঐ জীবনীশক্তিকে ব্যষ্টিগত ধারণার স্তরে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞাতসারে ঐ মুক্তির চেষ্টা উহাদের ভিতর কার্য করিতেছে, উদ্ভিদ্ জীবনধারণ করিতেছে—ইহার বৈচিত্র্য, নীতি ও রূপ রক্ষা করিবার জন্য, প্রকৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য নয়। প্রকৃতি উন্নতির প্রত্যেকটি সোপান নিয়মিত করিতেছে—এইরূপ ধারণা করিলে মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাবটি একেবারে উড়াইয়া দিতে হয়। জড়জগতের ভাব আগাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির ধারণাও আগাইয়া চলিয়াছে। তথাপি ক্রমাগত সংগ্রাম চলিতেছে। আমরা বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের বিবাদের কথা শুনিতেছি, কিন্তু মত ও সম্প্রদায়গুলি ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক, উহারা থাকিবেই। শৃঙ্খল যতই দীর্ঘ হইতেছে, দ্বন্দ্বও স্বাভাবিকভাবে ততই বাড়িতেছে, কিন্তু যদি আমরা শুধু জানি যে, আমরা সকলে সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে বিবাদের আর প্রয়োজন থাকে না।

মুক্তি বা স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ—প্রকৃতির প্রভুকে আমরা 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকি। আপনারা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহার কারণ মুক্তির ভাব ব্যতীত আপনারা এক মুহূর্তও চলাফেরা বা জীবনধারণ করিতে পারেন না। যদি আপনারা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তবে কি কখনও এখানে আসিতেন? খুব সম্ভব, প্রাণিতত্ত্ববিৎ এই মুক্ত হইবার অবিরাম চেষ্টার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং দিবেন। এ-সবই মানিয়া লইতে পারেন, তথাপি ঐ মুক্তির ভাবটি আমাদের ভিতর থাকিয়া যাইতেছে। 'আপনারা প্রকৃতির অধীন'—এই ভাবটি যেমন আপনারা অতিক্রম করিতে পারেন না, এ-ভাবটি যেমন সত্য, তেমনি এই মুক্তির ভাবটিও সত্য।

বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ—এ দ্বন্দ্ব থাকিবেই। বুঝিতে হইবে, যেখানেই কোন প্রকার বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও গুপ্তভাবে রহিয়াছে। একটি যদি সত্য হয়, তবে অপরটিও তেমনি সত্য হইবে। এই মুক্তির ধারণা অবশ্যই থাকিবে। আমরা অশিক্ষিত ব্যক্তির ভিতর বন্ধনের ধারণা দেখিতে পাই, এবং ঐ ধারণাকে মুক্তির চেষ্টা বলিয়া এখন বুঝিতে পারি না, তথাপি ঐ মুক্তির ভাব তাহার ভিতর রহিয়াছে। অশিক্ষিত বর্বর মানুষের মনে পাপ ও অপবিত্রতার বন্ধনের চেতনা অতি অল্প, কারণ তাহার প্রকৃতি পশুভাব অপেক্ষা বড় বেশী উন্নত নয়। সে দৈহিক বন্ধন, দেহ-সম্ভোগের অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু এই নিম্নতর চেতনা হইতে ক্রমে মানসিক বা নৈতিক বন্ধনের উচ্চতর ধারণা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং বৃদ্ধি পায়। এখানে আমরা দেখিতে পাই, সেই ঈশ্বরীয় ভাব অজ্ঞানাবরণের মধ্য দিয়া ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ ঐ আবরণ ঘন থাকে এবং সেই দিব্যজ্যোতি প্রায় আচ্ছাদিত থাকিতে পারে, কিন্তু সেই জ্যোতি—সেই মুক্তি ও পূর্ণতার উজ্জ্বল অগ্নি সদা পবিত্র ও অনির্বাণ রহিয়াছে। মানুষ এই দিব্যজ্যোতিকে বিশ্বের নিয়ন্তা, একমাত্র মুক্ত পুরুষের প্রতীক বলিয়া ধারণা করে। সে তখনও জানে না যে, সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড বস্তু—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, ধারণার তারতম্যে।

সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের উপাসনা-স্বরূপ। যেখানেই জীবন আছে, সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান এবং সেই মুক্তিই ঈশ্বর-স্বরূপ। এই মুক্তি দ্বারা অবশ্যই সমগ্র প্রকৃতির উপর

আধিপত্য লাভ হয় এবং জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব। আমরা যতই জ্ঞানী হই, ততই প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারি। প্রকৃতিকে বশ করিতে পারিলেই আমরা শক্তিসম্পন্ন হই; এবং যদি এমন কোন পুরুষ থাকেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু, তাঁহার অবশ্য প্রকৃতির পূর্ণজ্ঞান থাকিবে, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ হইবেন। মুক্তির সঙ্গে এইগুলি অবশ্য থাকিবে এবং যে ব্যক্তি এইগুলি লাভ করিয়াছেন, কেবল তিনিই প্রকৃতির পারে যাইতে পারিবেন।

বেদান্তে ঈশ্বরবিষয়ক যে- সকল তত্ত্ব আছে, সেগুলির মূলে পূর্ণ মুক্তি। এই মুক্তি হইতে প্রাপ্ত আনন্দ ও নিত্য শান্তি ধর্মের উচ্চতম ধারণা। ইহা সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা—যেখানে কোন কিছুর বন্ধন থাকিতে পারে না, যেখানে প্রকৃতি নাই, পরিবর্তন নাই, এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহাতে কোন পরিণাম উৎপন্ন করিতে পারে। এই একই মুক্তি আপনার ভিতর, আমার ভিতর রহিয়াছে এবং ইহাই একমাত্র যথার্থ মুক্তি।

ঈশ্বর সর্বদাই নিজ মহিমময় অপরিণামী স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আপনি ও আমি তাঁহার সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আবার এদিকে বন্ধনের কারণীভূত প্রকৃতি প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার, ধন, নাম-যশ, মানবীয় প্রেম এবং এ-সব পরিণামী প্রাকৃতিক বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যখন প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, উহার প্রকাশ কিসের উপর নির্ভর করিতেছে? ঈশ্বরের প্রকাশেই প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, সূর্য চন্দ্র তারার প্রকাশে নয়। যেখানেই কোন বস্তু প্রকাশ পায়, সূর্যের আলোকেই হউক অথবা আমাদের চেতনাতেই হউক, উহা তিনিই। তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সব কিছু প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা দেখিলাম, এই ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ; ইনি ব্যক্তি নন, অথচ সর্বজ্ঞ, প্রকৃতির জ্ঞাতা ও কর্তা, সকলের প্রভু। সকল উপাসনার মূলেই তিনি রহিয়াছেন; আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, তাঁহারই উপাসনা হইতেছে। শুধু তাহাই নয়, আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই—যাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হয়, যাহাকে আমরা মন্দ বলি, তাহাও ঈশ্বরেরই উপাসনা। তাহাও মুক্তিরই একটা দিক্ মাত্র। শুধু তাহাই নয়—আপনারা হয়তো আমার কথা শুনিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু আমি বলি, যখন আপনি কোন মন্দ কাজ

করিতেছেন, ঐ প্রবৃত্তির পিছনেও রহিয়াছে সেই মুক্তি। ঐ প্রেরণা হয়তো ভুল পথে চলিয়াছে, কিন্তু প্রেরণা সেখানে রহিয়াছে। পিছনে মুক্তির প্রেরণা না থাকিলে কোনরূপ জীবন বা কোনরূপ প্রেরণাই থাকিতে পারে না। বিশ্বের স্পন্দনের মধ্যে এই মুক্তি প্রাণবন্ত হইয়া আছে। সকলের হৃদয়ে যদি একত্ব না থাকিত, তবে আমরা বহুত্বের ধারণাই করিতে পারিতাম না, উপনিষদে ঈশ্বরের ধারণা এইরূপ। সময়ে সময়ে এই ধারণা আরও উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে—উহা আমাদের সমক্ষে এমন এক আদর্শ স্থাপন করে, যাহা দেখিয়া আমরা প্রথমে একেবারে স্তম্ভিত হই। সেই আদর্শ এই—স্বরূপতঃ আমরা ভগবানের সহিত অভিন্ন। যিনি প্রজাপতির পক্ষের বিচিত্রবর্ণ এবং ফুটন্ত গোলাপকলি, তিনিই শক্তিরূপে চারাগাছ ও প্রজাপতিতে বিরাজমান। যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, তিনিই আমাদের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার তেজ হইতেই জীবনের আবির্ভাব, আবার ভীষণ মৃত্যুও তাঁহারই শক্তি। তাঁহার ছায়াই মৃত্যু, আবার তাঁহার ছায়াই অমৃতত্ব। আরও এক উচ্চতর ধারণার কথা বলি। যাহা কিছু ভয়াবহ, তাহা হইতেই আমরা সকলে ব্যাধ-কর্তৃক অনুসৃত শশকের মত পলায়ন করিতেছি এবং তাহাদের মতই মাথা লুকাইয়া নিজেদের নিরাপদ ভাবিতেছি। সমগ্র জগৎই যাহা কিছু ভয়াবহ, তাহা হইতেই পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এক-সময়ে আমি কাশীতে একটা পথ দিয়া যাইতেছিলাম, উহার এক পাশে ছিল একটা প্রকাণ্ড জলাশয় ও অপর পাশে একটা উঁচু দেওয়াল। মাটিতে অনেকগুলি বানর ছিল; কাশীর বানরগুলি দীর্ঘকায় জানোয়ার এবং অনেক সময় অশিষ্ট। এখন ঐ বানরগুলির মাথায় খেয়াল উঠিল যে, তাহারা আমাকে সেই রাস্তা দিয়া যাইতে দিবে না। তাহারা ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল এবং আমার নিকট আসিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিল। তাহারা আমার আরও কাছে আসিতে থাকায় আমি দৌড়াইতে লাগিলাম; কিন্তু যতই দৌড়াই, ততই তাহারা আরও নিকটে আসিয়া আমাকে কামড়াইতে লাগিল। বানরদের হাত এড়ান অসম্ভব বোধ হইল—এমন সময় হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক আমাকে ডাক দিয়া বলিল, 'বানরগুলির সম্মুখীন হও।' আমি ফিরিয়া যেমন তাহাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলাম, অমনি তাহারা পিছু হটিয়া পলাইল। সমগ্র জীবনে আমাদের এই শিক্ষা পাইতে হইবে—যাহা কিছু ভয়ানক, তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, সাহসের

সহিত উহা রুখিতে হইবে। জীবনের দুঃখ-কষ্টের ভয়ে না পলাইয়া সম্মুখীন হইলেই বানরদলের মত সেগুলি হটিয়া যায়। যদি আমাদিগকে কখনও মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়, তবে প্রকৃতিকে জয় করিয়াই উহা লাভ করিব, প্রকৃতি হইতে পলায়ন করিয়া নয়। কাপুরুষেরা কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। যদি আমরা চাই—ভয় কষ্ট ও অজ্ঞান আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ঐগুলির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

মৃত্যু কি? ভয় কাহাকে বলে? এই-সকলের ভিতর কি ভগবানের মুখ দেখিতেছ না? দুঃখ ভয় ও কষ্ট হইতে দূরে পলায়ন কর, দেখিবে সেগুলি তোমাকে অনুসরণ করিবে। এগুলির সম্মুখীন হও, তবেই তাহারা পলাইবে। সমগ্র জগৎ সুখ ও আরামের উপাসক; যাহা দুঃখকর, তাহার উপাসনা করিতে খুব অল্প লোকেই সাহস করে। সুখ ও দুঃখ উভয়কে অতিক্রম করাই মুক্তির ভাব। মানুষ এই দ্বার অতিক্রম না করিলে মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের সকলকেই এগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের দেহ—প্রকৃতি, ভগবান্ ও আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছে। আমাদিগকে বজ্রের মধ্যে, লজ্জা দুঃখ দুর্বিপাক ও পাপতাপের মধ্যে তাঁহাকে উপাসনা করিতে ও ভালবাসিতে শিখিতে হইবে। সমগ্র জগৎ পুণ্যের ঈশ্বরকে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে। আমি একাধারে পুণ্য ও পাপের ঈশ্বরকে প্রচার করি। যদি সাহস থাকে, এই ঈশ্বরকে গ্রহণ কর—এই ঈশ্বরই মুক্তির একমাত্র পথ; তবেই সেই একত্বরূপ চরম সত্যে উপনীত হইতে পারিবে। তবেই একজন অপর অপেক্ষা বড়—এই ধারণা নষ্ট হইবে। যতই আমরা এই মুক্তির নিয়মের সন্নিহিত হই, ততই আমরা ঈশ্বরে শরণাগত হই, ততই আমাদের দুঃখকষ্ট চলিয়া যায়। তখন আমরা আর নরকের দ্বার হইতে স্বর্গদ্বারকে পৃথক্‌ভাবে দেখিব না, মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি করিয়া বলিব না, ‘আমি জগতের যে-কোন প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ।’ যতদিন আমরা সেই প্রভু ব্যতীত জগতে আর কাহাকেও না দেখি, ততদিন এই-সব দুঃখকষ্ট আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, এবং আমরা এই-সকল ভেদ দেখিব; কারণ সেই ভগবানেই—সেই আত্মাতেই আমরা সকলে

অভিন্ন, আর যতদিন না আমরা ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেছি, ততদিন এই একত্বানুভূতি হইবে না।

একই বৃক্ষে সুন্দরপক্ষযুক্ত নিত্যসখা-স্বরূপ দুইটি পক্ষী রহিয়াছে১—তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের অগ্রভাগে, অপরটি নিম্নে। নীচের সুন্দর পক্ষীটি বৃক্ষের স্বাদু ও কটু ফলগুলি ভক্ষণ করিতেছে—একবার একটি স্বাদু, পরমুহূর্তে আবার কটু ফল ভক্ষণ করিতেছে। যে মুহূর্তে পক্ষীটি কটু ফল খাইল, তাহার দুঃখ হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটি ফল খাইল এবং তাহাও যখন কটু লাগিল, তখন সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—অপর পক্ষীটি স্বাদু বা কটু কোন ফলই খাইতেছে না, নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া স্থির ধীর ভাবে বসিয়া আছে। তারপর বেচারা নীচের পাখীটি সব ভুলিয়া আবার স্বাদু ও কটু ফলগুলি খাইতে লাগিল; অবশেষে অতিশয় কটু একটি ফল খাইল, কিছুক্ষণ থামিয়া আবার সেই উপরের মহিমময় পক্ষীটির দিকে চাহিয়া দেখিল। অবশেষে ঐ উপরের পক্ষীটির দিকে অগ্রসর হইয়া সে যখন তাহার খুব সন্নিহিত হইল, তখন সেই উপরের পক্ষীর অঙ্গজ্যোতিঃ আসিয়া তাহার অঙ্গে লাগিল ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে তখন দেখিল, সে নিজেই উপরের পক্ষীতে রূপায়িত হইয়া গিয়াছে; সে শান্ত, মহিমময় ও মুক্ত হইয়া গিয়াছে; আর দেখিল—বৃক্ষে বরাবর একটি পক্ষীই রহিয়াছে। নীচের পক্ষীটি উপরের পক্ষীটির ছায়ামাত্র। অতএব আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, কিন্তু যেমন এক সূর্য লক্ষ শিশির বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র সূর্যরূপে প্রতীত হয়, তেমনি ঈশ্বরও বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হন। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন হইতে চাই, তবে প্রতিবিম্ব দূর হওয়া আবশ্যক। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কখনও আমাদের তৃপ্তির সীমা হইতে পারে না। সেইজন্যই কৃপণ অর্থের উপর অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে, দস্যু অপহরণ করে, পাপী পাপাচরণ করে, তোমরা দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা কর। সকলেরই এক উদ্দেশ্য। এই মুক্তি লাভ করা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই পূর্ণতালাভের চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেকেই এই পূর্ণতা লাভ করিবে।

যে-ব্যক্তি পাপতাপের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়াইতেছে, যে-ব্যক্তি নরকের পথ বাছিয়া লইয়াছে, সেও এই পূর্ণতালাভ করিবে, তবে তাহার কিছু বিলম্ব হইবে। আমরা তাহাকে

উদ্ধার করিতে পারি না। ঐ পথে চলিতে চলিতে সে যখন কতকগুলি শক্ত আঘাত খাইবে, তখন ভগবানের দিকে ফিরিবে; অবশেষে ধর্ম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা, ও আধ্যাত্মিকতার পথ খুঁজিয়া পাইবে। সকলে অজ্ঞাতসারে যাহা করিতেছে, তাহাই আমরা জ্ঞাতসারে করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেণ্ট পল এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, 'তোমরা যে-ঈশ্বরকে অজ্ঞাতসারে উপাসনা করিতেছ, তাঁহাকেই আমি তোমাদের নিকট ঘোষণা করিতেছি।' সমগ্র জগৎকে এই শিক্ষা শিখিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই-সব মতবাদ লইয়া কি হইবে, যদি এগুলি জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছিতে সাহায্য না করে? আমরা যেন বিভিন্ন বস্তুতে ভেদজ্ঞান দূর করিয়া সর্বত্র সমদর্শী হই—মানুষ নিজেকে সকল বস্তুতে দেখিতে শিখুক। আমরা যেন ঈশ্বর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধারণা লইয়া ধর্মমত বা সম্প্রদায়সমূহের উপাসক আর না হই, এবং জগতের সকলের ভিতর তাঁহাকে দর্শন করি। আপনারা যদি ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে নিজেদের হৃদয়ে যাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাকেই সর্বত্র উপাসনা করিবেন।

প্রথমতঃ এ-সকল সঙ্কীর্ণ ধারণা ত্যাগ কর এবং প্রত্যেকের মধ্যে সেই ঈশ্বরকে দর্শন কর, যিনি সকল হাত দিয়া কার্য করিতেছেন, সকল পা দিয়া চলিতেছেন, সকল মুখ দিয়া খাইতেছেন। প্রত্যেক জীবে তিনি বাস করেন, সকল মন দিয়া তিনি মনন করেন। তিনি স্বতঃপ্রমাণ—আমাদের নিকট হইতেও নিকটতর। ইহা জানাই ধর্ম—ইহা জানাই বিশ্বাস। প্রভু কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই বিশ্বাস প্রদান করুন। আমরা যখন সমগ্র জগতের এই অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিব, তখন অমৃতত্ব লাভ করিব। প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে দেখিলেও আমরা অমর, সমগ্র জগতের সহিত এক। যতদিন এ জগতে একজনও বাঁচিয়া থাকে, আমি তাহার মধ্যে জীবিত আছি। আমি এই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ব্যষ্টি জীব নই, আমি সমষ্টিস্বরূপ। অতীতে যত প্রাণী জন্মিয়াছিল, আমি তাহাদের সকলের জীবনস্বরূপ; আমিই বুদ্ধের, যীশুর ও মহম্মদের আত্মা। আমি সকল আচার্যের আত্মা, যে-সকল দস্যু অপহরণ করিয়াছে, যে-সকল হত্যাকারীর ফাঁসি হইয়াছে, আমি তাহাদের স্বরূপ, আমি সর্বময়। অতএব উঠ—ইহাই শ্রেষ্ঠ পূজা। তুমি সমগ্র জগতের সহিত অভিন্ন। ইহাই যথার্থ বিনয়—হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে কেবল 'আমি পাপী, আমি পাপী' বলার নাম বিনয় নয়। যখন এই

ভেদের আবরণ ছিন্ন হয়, তখনই সর্বোচ্চ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সমগ্র জগতের অখণ্ডত্বই—একত্বই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। আমি অমুক ব্যক্তি-বিশেষ—ইহা তো অতি সঙ্কীর্ণভাব—পাকা 'আমি'র পক্ষে ইহা সত্য নয়। আমি সর্বময়—এই ভাবের উপর দণ্ডায়মান হও এবং সেই পুরুষোত্তমকে সর্বোচ্চভাবে সতত উপাসনা কর, কারণ ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ এবং তাঁহাকে সত্য ও চৈতন্যরূপে উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার নিম্নতম প্রণালী অবলম্বনে মানুষের জড়বিষয়ক চিন্তাগুলি আধ্যাত্মিক উপাসনায় উন্নীত হয়, এবং অবশেষে সেই অখণ্ড অনন্ত ঈশ্বর চৈতন্যের মধ্য দিয়া উপাসিত হন। যাহা কিছু সান্ত, তাহা জড়; চৈতন্যই কেবল অনন্ত। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অনন্ত মানুষ চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং অনন্ত এবং কেবল অনন্তই অনন্তের উপাসনায় সমর্থ। আমরা সেই অনন্তের উপাসনা করিব; উহাই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপাসনা। এ-সকল ভাবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা কত কঠিন! আমি যখন কেবল কল্পনার সাহায্যে মত গঠন করি, কথা বলি, দার্শনিক বিচার করি এবং পর মুহূর্তে কোন কিছু আমার প্রতিকূল হইলে অজ্ঞাতসারে ক্রুদ্ধ হই, তখন ভুলিয়া যাই যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই ক্ষুদ্র সসীম আমি ছাড়া আর কিছু আছে; তখন বলিতে ভুলিয়া যাই যে, আমি চৈতন্যস্বরূপ, এ অকিঞ্চিৎকর জগৎ আমার নিকট কি? আমি চৈতন্যস্বরূপ। আমি তখন ভুলিয়া যাই যে, এ-সব আমারই খেলা—ভুলিয়া যাই ঈশ্বরকে, ভুলিয়া যাই মুক্তির কথা।

এই মুক্তির পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, দুরধিগম্য ও কঠিন—ইহা অতিক্রম করা কঠিন।২ঋষিরা এ-কথা বারবার বলিয়াছেন। তাহা হইলেও এ-সকল দুর্বলতা ও বিফলতা যেন তোমাকে বদ্ধ না করে। উপনিষদের বাণীঃ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' উঠ—জাগ, যতদিন না সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতেছ, ততদিন নিশ্চেষ্ট থাকিও না। যদিও ঐ পথ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—দুরতিক্রম্য, দীর্ঘ ও কঠিন; আমরা ইহা অতিক্রম করিবই করিব। মানুষ সাধনাবলে দেবাসুরের প্রভু হয়। আমরা ব্যতীত আমাদের দুঃখের জন্য আর কেহই দায়ী নয়। তুমি কি মনে কর, মানুষ যদি অমৃতের অনুসন্ধান করে, তৎপরিবর্তে সে বিষ লাভ করিবে? অমৃত আছেই এবং যে উহা পাইবার চেষ্টা করে, সে পাইবেই। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেনঃ সকল ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র

আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে ভবসাগরের পরপারে লইয়া যাইব, ভীত হইও না।৩

এই বাণী জগতের সকল ধর্মশাস্ত্রেই আমরা শুনিতে পাই। সেই একই বাণী আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, 'স্বর্গে যেমন, মর্ত্যেও তেমনি—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কারণ সবই তোমার রাজত্ব, তোমার শক্তি, তোমার মহিমা।'৪ কঠিন—বড় কঠিন কথা। আমি নিজে নিজে বলি, 'হে প্রভু, আমি এখনই তোমার শরণ লইব—প্রেমময়, তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ করিব, তোমার বেদীতে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু পুণ্য—সবই স্থাপন করিব। আমার পাপতাপ, আমার ভালমন্দ—সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিব। তুমি সব গ্রহণ কর, আমি তোমাকে কখনও ভুলিব না।' এক মুহূর্তে বলি, ' তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'; পর মুহূর্তেই একটা কিছু আসিয়া উপস্থিত হয় আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তখন আমি ক্রোধে লাফাইয়া উঠি। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু আচার্য বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন। এই মিথ্যা 'আমি'-কে মারিয়া ফেল, তাহা হইলেই পাকা 'আমি' বিরাজ করিবে। হিব্রু শাস্ত্র বলেন, 'তোমাদের প্রভু আমি ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর—আমার সম্মুখে তোমার অন্য দেবতাদের উপাসনা করিলে চলিবে না।'৫ সেখানে একমাত্র ঈশ্বরই রাজত্ব করিবেন। আমাদের বলিতে হইবে—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।'—আমি নই, তুমি। তখন সেই প্রভুকে ব্যতীত আমাদিগকে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; তিনি, শুধু তিনিই রাজত্ব করিবেন। হয়তো আমরা খুব কঠোর সাধনা করি, তথাপি পরমুহূর্তেই আমাদের পদস্খলন হয় এবং তখন আমরা জগজ্জননীর নিকট হাত বাড়াইতে চেষ্টা করি; বুঝিতে পারি, জগজ্জননীর সহায়তা ব্যতীত আমরা দাঁড়াইতে পারি না। জীবন অনন্ত, উহার একটি অধ্যায় এইঃ 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' এবং জীবনগ্রন্থের সকল অধ্যায়ের মর্মগ্রহণ করিতে না পারিলে সমগ্র জীবন উপলব্ধি করিতে পারি না। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতক মন এই ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি কাঁচা 'আমি'-কে জয় করিতে হইলে বারবার ঐ কথা অবশ্য বলিতে হইবে। আমরা বিশ্বাসঘাতকের সেবা করিব অথচ পরিত্রাণ পাইব—ইহা কখনও হইতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত সকলেই পরিত্রাণ পাইবে এবং যখন আমরা আমাদের 'পাকা আমি'র বাণী অমান্য করি, তখনই

বিশ্বাসঘাতক—নিজেদের বিরুদ্ধে এবং জগজ্জননীর মহিমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দিত হই। যাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের দেহ ও মন সেই মহান্ ইচ্ছাময়ের নিকট সমর্পণ করিব। হিন্দু দার্শনিক ঠিক কথাই বলিয়াছেনঃ যদি মানুষ দুইবার উচ্চারণ করে, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', সে পাপাচরণ করে। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—ইহার বেশী আর কি প্রয়োজন? উহা দুইবার বলিবার আবশ্যক কি? যাহা ভাল, তাহা তো ভালই। একবার যখন বলিয়াছি, তখন ঐ কথা ফিরাইয়া লওয়া চলিবে না। 'স্বর্গের ন্যায় মর্ত্যেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কারণ তোমারই সব রাজত্ব, সব শক্তি; সব মহিমা চিরদিনের জন্য তোমারই।'

২. ধর্মের প্রয়োজন

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

মানবজাতির ভাগ্যগঠনের জন্য যতগুলি শক্তি কার্য করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, ঐ সকলের মধ্যে ধর্মরূপে অভিব্যক্ত শক্তি অপেক্ষা কোন শক্তি নিশ্চয়ই অধিকতর প্রভাবশালী নয়। সর্বপ্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে কোথাও না কোথাও সেই অপূর্ব শক্তির কার্যকারিতা বিদ্যমান এবং সকল ব্যষ্টিমানবের মধ্যে সংহতির মহত্তম প্রেরণা এই শক্তি হইতেই উদ্ভূত। ইহা আমরা সকলেই স্পষ্টভাবে জানি যে, অগণিত ক্ষেত্রে ধর্মের বন্ধন—জাতি, জলবায়ু, এমন কি বংশের বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর। ইহা সুবিদিত সত্য যে, যাহারা একই ঈশ্বরের উপাসক, একই ধর্মে বিশ্বাসী, তাহারা একই বংশজাত লোকদের, এমন কি ভ্রাতাদের অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত পরস্পরের সাহায্য করিয়াছে। ধর্মের উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য বহু প্রকার চেষ্টা হইয়াছে। যে-সকল প্রাচীন ধর্ম বর্তমান কালাবধি টিকিয়া আছে, ঐগুলির এই একটি দাবী যে, তাহারা সকলেই অতিপ্রাকৃত; তাহাদের উৎপত্তি যেন মানুষের মস্তিষ্ক হইতে হয় নাই; বাহিরের কোন স্থান হইতে ধর্মগুলি আসিয়াছে।

আধুনিক পণ্ডিত সমাজে এ সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—একটি ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, অপরটি অনন্ত ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ। একপক্ষ বলেন, পিতৃপুরুষদের উপাসনা হইতেই ধর্মীয় ধারণার আরম্ভ; অপর পক্ষ বলেন, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহে মানবধর্মের আরোপ হইতেই ধর্মের সূচনা। মানুষ তাহার মৃত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতিরক্ষা করিতে চায় এবং ভাবে যে, মৃত ব্যক্তিদের দেহনাশ হইলেও তাহারা জীবিত থাকে, এবং সেইজন্যই সে তাহাদের উদ্দেশে খাদ্যাদি উৎসর্গ করিতে এবং কতকটা তাহাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এই ধারণার পরিণতিই আমাদের নিকট ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে।

মিশর, ব্যাবিলন ও চীনবাসীদের এবং আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের বহু জাতির প্রাচীন ধর্মসমূহ আলোচনা করিলে পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই যে ধর্মের আরম্ভ, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। প্রাচীন মিশরীয়দের আত্মা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ধারণা ছিল—প্রত্যেক দেহে তদনুরূপ আর একটি 'দ্বিতীয়' চেতন-সত্তা থাকে। প্রত্যেক মানুষের দেহে প্রায় তাহারই অনুরূপ আর একটি সত্তা থাকে; মানুষের মৃত্যু হইলে এই দ্বিতীয় সত্তা দেহ ছাড়িয়া যায়, অথচ তখনও সে বাঁচিয়া থাকে। যতদিন মৃতদেহ অটুট থাকে, শুধু ততদিনই এই দ্বিতীয় সত্তা বিদ্যমান থাকিতে পারে। সেইজন্যই এই দেহটাকে অক্ষত রাখিবার জন্য মিশরীয়দের এত আগ্রহ দেখিতে পাই। এইজন্যই তাহারা ঐ-সব সুবৃহৎ পিরামিড নির্মাণ করিয়া ঐগুলির মধ্যে মৃতদেহ রক্ষা করিত। কারণ তাহাদের ধারণা ছিল যে, মৃতদেহের কোন অংশ নষ্ট হইলে দ্বিতীয় সত্তারও অনুরূপ অংশটি নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা স্পষ্টতই পিতৃপুরুষের উপাসনা। প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এই দ্বিতীয় জীবসত্তার ধারণা প্রচলিত ছিল। তাহাদের মতে—মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবসত্তায় স্নেহবোধ নষ্ট হইয়া যায়। সে খাদ্য, পানীয় এবং নানারূপ সাহায্যের জন্য জীবিত মনুষ্যদিগকে ভয় দেখায়। এমন কি, সে নিজ সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীর প্রতিও সমস্ত স্নেহ-মমতা হারাইয়া ফেলে। প্রাচীন হিন্দুদের ভিতরেও এই প্রকার পূর্বপুরুষদের পূজার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। চীনজাতির মধ্যেও এই পিতৃগণের পূজাই তাহাদের ধর্মের মূলভিত্তি বলা যাইতে পারে এবং এখনও এই বিশ্বাস ঐ বিরাট দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচলিত। বলিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পিতৃ-উপাসনাই সমগ্র চীনদেশে ধর্মাকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে যাঁহারা এই মতবাদ বিশ্বাস করেন যে, পিতৃপুরুষের উপাসনা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের ধারণা সুষ্ঠুভাবে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পক্ষান্তরে এমন অনেক মনীষী আছেন, যাঁহারা প্রাচীন আর্য সাহিত্য (শাস্ত্র) হইতে দেখান যে, প্রকৃতির উপাসনা হইতেই ধর্মের সূচনা। যদিও ভারতবর্ষের সর্বত্র পূর্বপুরুষের পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীনতম শাস্ত্রে তাহার কোন চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর্যদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতাতে আমরা ইহার কোন নিদর্শন পাই না।

আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদে প্রকৃতির উপাসনাই দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে মানবমন যেন বহির্জগতের অন্তরালে অবস্থিত বস্তুর আভাস পাওয়ার জন্য চেষ্টিত বলিয়া বোধ হয়। ঊষা, সন্ধ্যা, ঝঞ্ঝা—প্রকৃতির অদ্ভুত ও বিশাল শক্তিসমূহ ও সৌন্দর্য মানবমনকে আকর্ষণ করে। সেই মানবমন প্রকৃতির পরপারে যাইয়া সেখানে যাহা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। এই প্রচেষ্টায় তাহারা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আত্মা ও শরীরাদি দিয়া মানবীয় গুণরাশিতে ভূষিত করে। এগুলি তাহাদের ধারণায় কখনও সৌন্দর্যমণ্ডিত, কখনও বা ইন্দ্রিয়ের অতীত। এই-সব চেষ্টার অন্তে এই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিগুলি তাহাদের নিকট মানবধর্মে ভূষিত হউক বা না হউক, নিছক ভাবময় বস্তুতে পরিণত হয়। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও এই প্রকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের পুরাণসমূহ কেবল এই ভাবময় প্রকৃতির উপাসনায় পূর্ণ। প্রাচীন জার্মান, স্কাণ্ডিনেভীয় এবং অন্যান্য আর্যজাতিদের মধ্যেও অনুরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পক্ষেও সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে চেতন ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই মতদ্বয় পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও তৃতীয় এক ভিত্তি অবলম্বনে উহাদের সামঞ্জস্য-বিধান করা যাইতে পারে; আমার মনে হয়, উহাই ধর্মের প্রকৃত উৎস এবং ইহাকে আমি 'ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা' বলিতে ইচ্ছা করি। মানুষ একদিকে তাহার পিতৃপুরুষগণের আত্মার অথবা প্রেতাত্মার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, অর্থাৎ শরীর-নাশের পর কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে চায়; কিংবা অপর দিকে এই বিশাল জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরালে যে শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে, তাহার স্বরূপ জানিতে সচেষ্ট হয়। এই উভয়ের মধ্যে মানুষ যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, ইহা সুনিশ্চিত যে, সে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের সীমা অতিক্রম করিতে চায়। ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যেই সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যাইতে চায়। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাও রহস্যপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় যে, ধর্মের প্রথম আভাস স্বপ্নের ভিতর দিয়াই আসে। অমরত্বের প্রথম ধারণা মানুষ স্বপ্নের ভিতর দিয়া অনায়াসে পাইতে পারে। এই স্বপ্ন কি একটা অত্যাশ্চর্য অবস্থা নয়? আমরা

জানি যে, শিশুগণ এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহাদের জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যে অতি অল্প পার্থক্য অনুভব করে। স্বপ্নাবস্থায় দেহ মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলেও মন যখন ঐ অবস্থায়ও তাহার সমুদয় জটিল কার্য চালাইয়া যাইতে থাকে, তখন অমরত্ব-বিষয়ে ঐ-সব ব্যক্তি যে সহজলভ্য প্রমাণ পাইয়া থাকে, উহা অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক যুক্তি আর কি থাকিতে পারে? অতএব মানুষ যদি তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে, এই দেহ চিরকালের মত নষ্ট হইয়া গেলেও পূর্ববৎ ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমার মতে অলৌকিক তত্ত্ব-বিষয়ে এই ব্যাখ্যাটি অধিকতর স্বাভাবিক এবং এই স্বপ্নাবস্থার ধারণা অবলম্বনেই মানব-মন ক্রমশঃ উচ্চতর তত্ত্বে উপনীত হয়। অবশ্য ইহাও সত্য যে, কালে অধিকাংশ মানুষই বুঝিতে পারিয়াছিল, জাগ্রদবস্থায় তাহাদের এই স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না, এবং স্বপ্নাবস্থায় যে মানুষের কোন অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাও নয়; পরন্তু সে তখন জাগ্রৎ-কালীন অভিজ্ঞতাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র।
কিন্তু ইতোমধ্যে মানব-মনে সত্যানুসন্ধিৎসা অঙ্কুরিত হইয়া গিয়াছে এবং উহার গতি অন্তর্মুখে চলিয়াছে। মানুষ এখন তাহার মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলি আরও গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং জাগরণ ও স্বপ্নের অবস্থা অপেক্ষাও উচ্চতর একটি অবস্থা আবিষ্কার করিল। ভাবাবেশ বা ভগবৎপ্রেরণা নামে পরিচিত এই অবস্থাটির কথা আমরা পৃথিবীর সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের মধ্যেই পাই। সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মেই ঘোষিত হয় যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা—অবতারকল্প মহাপুরুষ বা ঈশদূতগণ মনের এমন সব উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, যাহা নিদ্রা ও জাগরণ হইতে ভিন্ন এবং সেখানে তাহারা অধ্যাত্ম-জগৎ নামে পরিচিত এক অবস্থাবিশেষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অভিনব সত্যসমূহ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমরা জাগ্রদবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ যেভাবে অনুভব করি, তাঁহারা পূর্বোক্ত অবস্থায় পৌঁছিয়া সেগুলি আরও স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করেন।
দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণদের ধর্মকে লওয়া যাক। বেদসমূহ ঋষিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই-সকল ঋষি কতিপয় সত্যের দ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত 'ঋষি' শব্দের প্রকৃত অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ বৈদিক স্তুতিসমূহের বা চিন্তারাশির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। ঋষিগণ বলেন, তাঁহারা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছেন বা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যদি

'অতীন্দ্রিয়' বিষয় সম্পর্কে 'প্রত্যক্ষ' কথাটি ব্যবহার করা চলে। এই সত্যসমূহ তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই একই সত্য য়াহুদী এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যেও বিঘোষিত হইতে দেখা যায়।

বৌদ্ধ-মতাবলম্বী 'হীনযান' সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথা উঠিতে পারে। জিজ্ঞাস্য এই যে, বৌদ্ধেরা যখন কোন আত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তখন তাহাদের ধর্ম কিরূপে এই অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইবে? ইহার উত্তর এই যে, বৌদ্ধেরাও এক শাশ্বত নৈতিক বিধানে বিশ্বাসী এবং সেই নীতি-বিধান আমরা যে অর্থে 'যুক্তি' বুঝি, তাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পৌঁছিয়া বুদ্ধদেব উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, এমন কি 'এশিয়ার আলো' (The Light of Asia) নামক অপূর্ব কাব্যগ্রন্থে নিবদ্ধ অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশসমূহ এই অবস্থা হইতেই আসিয়াছে, বুদ্ধির গবেষণা হইতে নয়।

অতএব সকল ধর্মেই এই এক আশ্চর্য বাণী ঘোষিত হয় যে, মানব-মন কোন কোন সময় শুধু ইন্দ্রিয়ের সীমাই অতিক্রম করে না, বিচারশক্তিও অতিক্রম করে। তখন এই মন এমন সব তথ্য প্রত্যক্ষ করে, যেগুলির ধারণা সে কোন কালে করিতে পারিত না এবং যুক্তির দ্বারাও পাইত না। এই তথ্যসমূহই জগতের সকল ধর্মের মূল ভিত্তি। অবশ্য এই তথ্যগুলি সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিবার এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিবার অধিকার আমাদের আছে; তথাপি জগতের সকল প্রচলিত ধর্মমতেই দাবী করা হয় যে, মানব-মনের এমন এক অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহার বলে সে ইন্দ্রিয় ও বিচারশক্তির সীমা অতিক্রম করিতে পারে; অধিকন্তু তাহারা এই শক্তিকে একটি বাস্তব সত্য বলিয়াই দাবী করে।

সকল ধর্মেই স্বীকৃত এই-সকল তথ্য কতদূর সত্য, তাহা বিচার না করিয়াও আমরা তাহাদের একটি সাধারণ বিশেষত্ব দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত স্থূল তথ্যগুলির তুলনায় ধর্মের আবিষ্কারগুলি অতি সূক্ষ্ম, এবং যে-সকল ধর্ম

অতি উন্নত প্রণালীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি সবই এক সূক্ষ্মতম তত্ত্ব স্বীকার করে; কাহারও মতে উহা হয়তো এক নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম সত্তা, অথবা সর্বব্যাপী পুরুষ, অথবা ঈশ্বর-নামধেয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষ, অথবা নৈতিক বিধি; আবার কাহারও মতে উহা হয়তো সকল সত্তার অন্তর্নিহিত সার সত্য। এমন কি আধুনিক কালে মনের অতীন্দ্রিয় অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া ধর্মমত-প্রচারের যত প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতেও প্রাচীনদের স্বীকৃত পুরাতন সূক্ষ্মভাবগুলিই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ঐগুলিকে নীতি-বিধান (Moral Law), আদর্শগত ঐক্য (Ideal Unity) প্রভৃতি নূতন নামে অভিহিত করা হইতেছে এবং ইহা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, এই-সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আমাদের মধ্যে কেহই এ-পর্যন্ত কোন আদর্শ মানুষ দেখে নাই, তথাপি আমাদিগকে এরূপ এক ব্যক্তিতে বিশ্বাসী হইতে বলা হয়। আমাদের মধ্যে কেহই এ-পর্যন্ত পূর্ণ আদর্শ মানুষ দেখে নাই, তথাপি সেই আদর্শ ব্যতীত আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারি না। বিভিন্ন ধর্ম হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এক সূক্ষ্ম অখণ্ড সত্তা আছে, যাহাকে কখনও আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষরূপে, অথবা নীতিবাদরূপে, অথবা নিরাকার সত্তারূপে, অথবা সর্বানুস্যূত সারবস্তুরূপে উপস্থাপিত করা হয়। আমরা সর্বদাই সেই আদর্শে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেক মানুষ যেমনই হউক বা যেখানেই থাকুক, তাহার অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে একটা নিজস্ব আদর্শ আছে, প্রত্যেকেরই এক অসীম আনন্দের আদর্শ আছে। আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, সর্বত্র যে কর্মচাঞ্চল্য প্রকটিত হয়, এগুলি অধিকাংশই এই অনন্ত শক্তি-অর্জনের, এই অসীম আনন্দ-লাভের প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক অচিরেই বুঝিতে পারে যে, যদিও তাহারা অনন্ত শক্তিলাভের প্রচেষ্টায় নিরত হইয়াছে, তথাপি সেই শক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য নয়। তাহারা অবিলম্বে বুঝিতে পারে যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই অনন্ত সুখ লাভ করা যায় না। অন্যভাবে এরূপ বলা চলে যে, ইন্দ্রিয়গুলি ও দেহ এত সীমাবদ্ধ যে, সেগুলি অসীমকে প্রকাশ করিতে পারে না। অসীমকে সীমার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব; কালে মানুষ অসীমকে সসীমের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতে শেখে। এই ত্যাগ, এই চেষ্টা করাই নীতিশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। ত্যাগের ভিত্তির উপরই নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

এমন কোন নীতি কোন কালে প্রচারিত হয় নাই, যাহার মূলে ত্যাগ নাই। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—ইহাই নীতিশাস্ত্রের চিরন্তন বাণী। নীতিশাস্ত্রের উপদেশ—'স্বার্থ নয়, পরার্থ।' নীতিশাস্ত্র বলে, সেই অনন্ত শক্তি বা অনন্ত সুখকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া লাভ করিতে সচেষ্ট মানুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে একটা যে মিথ্যা ধারণা আঁকড়াইয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করিতেই হইবে। নিজেকে সর্বপশ্চাতে রাখিয়া অন্যকে প্রাধান্য দিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সমূহ বলে, 'আমারই হইবে প্রথম স্থান।' নীতিশাস্ত্র বলে, 'না, আমি থাকিব সর্বশেষে।' সুতরাং সকল নীতিশাস্ত্রই এই ত্যাগের—জড়জগতে স্বার্থবিলোপের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বার্থরক্ষার উপর নয়। এই জড়জগতে কখনও সেই অনন্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইবে না, ইহা অসম্ভব অথবা কল্পনারও অযোগ্য।

সুতরাং মানুষকে জড়জগৎ ত্যাগ করিয়া সেই অনন্তের গভীরতর প্রকাশের অন্বেষণে আরও উচ্চতর ভাব-ভূমিতে উঠিতে হইবে। এই ভাবেই বিভিন্ন নৈতিক বিধি রচিত হইতেছে; কিন্তু সকলেরই সেই এক মূল আদর্শ—চিরন্তন আত্মত্যাগ। অহঙ্কারের পূর্ণ বিনাশই নীতিশাস্ত্রের আদর্শ। যদি মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্বের চিন্তা করিতে নিষেধ করা হয়, তবে সে শিহরিয়া উঠে। তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারাইতে অত্যন্ত ভীত বলিয়া মনে হয়। অথচ সেই-সব লোকই আবার প্রচার করে যে, নীতিশাস্ত্রের উচ্চতম আদর্শগুলিই যথার্থ; তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না, সকল নীতিশাস্ত্রের গণ্ডী, লক্ষ্য এবং অন্তর্নিহিত ভাবই হইল এই 'অহং'-এর নাশ, উহার বৃদ্ধি নয়।

হিতবাদের (বা প্রয়োজনবাদের) আদর্শ মানুষের নৈতিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কারণ প্রথমতঃ প্রয়োজনের বিবেচনায় কোন নৈতিক নিয়ম আবিষ্কার করা যায় না। অলৌকিক অনুমোদন অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অনুভূতি বলিতে পছন্দ করি, তাহা ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না। যে-কোন নীতিশাস্ত্র মানুষকে তাহার নিজ সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রযোজ্য নৈতিক বিধি ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। হিতবাদীরা অনন্তকে পাইবার সাধনা এবং অতীন্দ্রিয় বস্তু লাভের আশা ত্যাগ করিতে বলেন; তাঁহাদের মতে ইহা অসাধ্য ও অযৌক্তিক। আবার

তাঁহারাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে নীতি অবলম্বন এবং সমাজের কল্যাণসাধন করিতে বলেন। কেন আমরা কল্যাণ করিব? হিত করা তো গৌণ ব্যাপার। আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। নীতিশাস্ত্র তো লক্ষ্য নয়, উহা উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মাত্র। লক্ষ্যই যদি না থাকে, তবে আমরা নীতিপরায়ণ হইব কেন? কেন আমি অন্যের অনিষ্ট না করিয়া উপকার করিব? সুখই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন আমি নিজেকে সুখী এবং অপরকে দুঃখী করিব না? আমাকে বাধা দেয় কিসে? দ্বিতীয়তঃ হিতবাদের ভিত্তি অতীব সঙ্কীর্ণ। যে-সকল সামাজিক রীতিনীতি ও কার্যধারা প্রচলিত অছে, সেগুলি সমাজের বর্তমান অবস্থা হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হিতবাদীদের এমন কী অধিকার আছে যে, তাঁহারা সমাজকে চিরন্তন বলিয়া কল্পনা করিবেন? বহুযুগ পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না, খুব সম্ভব বহুযুগ পরেও থাকিবে না। খুব সম্ভব উচ্চতর ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর হইবার পথে এই সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের অন্যতম সোপান। শুধু সমাজ-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত কোন বিধিই চিরন্তন হইতে পারে না এবং সমগ্র মানব-প্রকৃতির পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না। অতএব হিতবাদ-সম্ভূত মতগুলি বড়জোর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় কার্যকর হইতে পারে। তাহার বাহিরে উহাদের কোন মূল্য নাই। কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হইতে উদ্ভূত চরিত্রনীতি ও নৈতিক বিধির কার্যক্ষেত্র বা পরিধি সমষ্টি মানবের সমগ্র দিক্। ইহা ব্যষ্টির সম্পর্কে প্রযুক্ত হইলেও ইহার সম্পর্ক সমষ্টির সহিত। সমাজও ইহার অন্তর্ভুক্ত, কারণ সমাজ তো ব্যষ্টিনিচয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু এই নৈতিক বিধি ব্যষ্টি ও তাহার অনন্ত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেহেতু সমাজ যে-কোন সময়ে যে-কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহা সমুদয় সামাজিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এইরূপে দেখা যায় যে, মানব-জাতির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন সর্বদাই আছে। জড় যতই সুখকর হউক না কেন, মানুষ সর্বদা জড়ের চিন্তা করিতে পারে না।

লোকে বলে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশী মনোযোগ দিলে আমাদের ব্যাবহারিক জগতে প্রমাদ ঘটে। সুদূর অতীতে চৈনিক ঋষি কন্‌ফ্যুসিয়াসের সময়ে বলা হইত—'আগে ইহলোকের সুব্যবস্থা করিতে হইবে; ইহলোকের ব্যবস্থা হইয়া গেলে পরলোকের কথা ভাবিব।' ইহা বেশ সুন্দর কথা যে, আমরা ইহ-জগতের কার্যে তৎপর হইব, কিন্তু ইহাও

দ্রষ্টব্য যে, যদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগের ফলে ব্যাবহারিক জীবনে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তথাকথিত বাস্তব-জীবনের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশের ফলে আমাদের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই ক্ষতি হইয়া থাকে। এই ভাবে চলিলে মানুষ জড়বাদী হইয়া পড়ে, কারণ প্রকৃতিই মানুষের লক্ষ্য নয়—মানুষের লক্ষ্য তদপেক্ষা উচ্চতর বস্তু।

যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে। এই প্রকৃতির দুইটি রূপ—অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি। যে নিয়মগুলি আমাদের বাহিরের ও শরীরের ভিতরের জড় কণিকাসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে, কেবল সেগুলিই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়, পরন্তু সূক্ষ্মতর অন্তঃপ্রকৃতিও উহার অন্তর্ভুক্ত; বস্তুতঃ এই সূক্ষ্মতর প্রকৃতিই বহির্জগতের নিয়ামক শক্তি। বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করা খুবই ভাল ও বড় কথা; কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করা আরও মহত্তর। যে-সকল নিয়মানুসারে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরিচালিত হয়, সেগুলি জানা উত্তম, কিন্তু যে-সকল নিয়মানুসারে মানুষের কামনা, মনোবৃত্তি ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি জানা অনন্তগুণে মহত্তর ও উৎকৃষ্ট। অন্তর্মানবের এই জয়, মানব-মনের যে-সকল সূক্ষ্ম ক্রিয়াশক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলির রহস্য জানা—সবই সম্পূর্ণরূপে ধর্মের অন্তর্গত। মানব-প্রকৃতি—আমি সাধারণ মানব-প্রকৃতির কথা বলিতেছি—বড় বড় প্রাকৃতিক ঘটনা দেখিতে চায়। সাধারণ মানুষ সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা করিতে পারে না। ইহা বেশ বলা হয় যে, সাধারণ লোকে সহস্র মেষশাবক-হত্যাকারী সিংহেরই প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহারা একবারও ভাবে না যে, ইহাতে এক হাজার মেষের মৃত্যু ঘটিল, যদিও সিংহটার ক্ষণস্থায়ী জয় হইয়াছে; তাহারা কেবল শারীরিক শক্তির প্রকাশেই আনন্দ অনুভব করে। সাধারণ মানব-মনের ধারাই এইরূপ। তাহারা বাহিরের বিষয় বোঝে এবং তাহাতেই সুখ অনুভব করে; কিন্তু প্রত্যেক সমাজে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের আনন্দ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে নাই, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে; তাঁহারা মাঝে মাঝে জড়বস্তু অপেক্ষা উচ্চতর কিছুর আভাস পাইয়া থাকেন এবং উহা পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিলে আমরা সর্বদা দেখিতে পাইব যে, এরূপ সূক্ষ্মদর্শী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে জাতির উন্নতি হয় এবং অনন্তের অনুসন্ধান বন্ধ হইলে তাহার পতন আরম্ভ হয়, হিতবাদীরা এই অনুসন্ধানকে যতই বৃথা বলুক না কেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির শক্তির মূল উৎস হইতেছে তাহার আধ্যাত্মিকতা, এবং যখনই ঐ জাতির ধর্ম ক্ষীণ হয় এবং জড়বাদ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে, তখনই সেই জাতির ধ্বংস আরম্ভ হয়।

এইরূপ ধর্ম হইতে আমরা যে-সকল তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারি, যে-সান্ত্বনা পাইতে পারি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও ধর্ম অন্যতম বিজ্ঞান অথবা গবেষণার বস্তু হিসাবে মানব-মনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কল্যাণকর অনুশীলনের বিষয়। অনন্তের এই অনুসন্ধান, অনন্তকে ধারণা করিবার এই সাধনা, ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যেন জড়ের বাহিরে যাইবার এবং আধ্যাত্মিক মানবের ক্রমবিকাশ-সাধনের এই প্রচেষ্টা—অনন্তকে আমাদের সত্তার সঙ্গে একীভূত করিবার এই নিরন্তর প্রয়াস—এই সংগ্রামই মানুষের সর্বোচ্চ গৌরব ও মহত্ত্বের বিকাশ। কেহ কেহ ভোজনে সর্বাধিক আনন্দ পায়, আমাদের বলিবার কোন অধিকার নাই যে, তাহাদের উহাতে আনন্দ পাওয়া উচিত নয়। আবার কেহ কেহ সামান্য কিছু লাভ করিলেই অত্যন্ত সুখ বোধ করে; তাহাদের পক্ষে উহা অনুচিত—এরূপ বলিবার অধিকার আমাদের নাই। তেমনি আবার যে-মানুষ ধর্মচিন্তায় সর্বোচ্চ আনন্দ পাইতেছে, তাহাকে বাধা দিবারও উহাদের কোন অধিকার নাই। যে-প্রাণী যত নিম্নস্তরের হইবে, ইন্দ্রিয়সুখে সে তত অধিক সুখ পাইবে। শৃগাল-কুকুর যতখানি আগ্রহের সহিত ভোজন করে, কম লোকই সেভাবে আহার করিতে পারে। কিন্তু শৃগাল-কুকুরের সুখানুভূতির সবটাই যেন তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখভোগ করে এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরা চিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় সেই সুখ পাইয়া থাকে। আধ্যাত্মিকতার রাজ্য আরও উচ্চতর। উহার বিষয়টি অনন্ত হওয়ায় ঐ রাজ্যও সর্বোচ্চ এবং যাহারা উহা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে ঐ স্তরের সুখও সর্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং 'মানুষকে সুখানুসন্ধান করিতে হইবে'—হিতবাদীর এই মত মানিয়া লইলেও মানুষের পক্ষে ধর্মচিন্তার অনুশীলন করা উচিত; কারণ ধর্মানুশীলনেই উচ্চতম সুখ আছে। সুতরাং আমার মতে ধর্মানুশীলন একান্ত প্রয়োজন। ইহার ফল হইতেও আমরা

তাহা বুঝিতে পারি। মানব-মনকে গতিশীল করিবার জন্য ধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামক শক্তি। ধর্ম আমাদের ভিতর যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে, অন্য কোন আদর্শ তাহা পারে না। মানব-জাতির ইতিহাস হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে অতীতে এইরূপই হইয়াছে, এবং ধর্মের শক্তি এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। কেবল হিতবাদ অবলম্বন করিলেই মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। এ জগতে এমন বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা হিতবাদ অনুসরণ করিয়াও সম্পূর্ণ নির্দোষ, নীতিপরায়ণ এবং সরল ছিলেন। কিন্তু যে-সকল মহামানব বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের স্রষ্টা, যাঁহারা জগতে যেন চৌম্বকশক্তিরাশি সঞ্চারিত করেন, যাঁহাদের শক্তি শত সহস্র ব্যক্তির উপর কাজ করে, যাঁহাদের জীবন অপরের জীবনে আধ্যাত্মিক অগ্নি প্রজ্বলিত করে, এরূপ মহাপুরুষদের মধ্যে আমরা সর্বদা অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণা দেখিতে পাই। তাঁহাদের প্রেরণাশক্তি ধর্ম হইতে আসিয়াছে। যে অনন্ত শক্তিতে মানুষের জন্মগত অধিকার, যাহা তাহার প্রকৃতিগত, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য ধর্মই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রেরণা দেয়। চরিত্র-গঠনে, সৎ ও মহৎ কার্য-সম্পাদনে, নিজের ও অপরের জীবনে শান্তিস্থাপনে ধর্মই সর্বোচ্চ প্রেরণাশক্তি; অতএব সেই দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার অনুশীলন করা উচিত। পূর্বাপেক্ষা উদার ভিত্তিতে ধর্মের অনুশীলন আবশ্যক। সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও বিবদমান ধর্মভাব দূর করিতে হইবে। সকল সাম্প্রদায়িক, স্বজাতীয় বা স্বগোত্রীয় ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর নিজস্ব ঈশ্বর থাকিবেন এবং অপর সকলের ঈশ্বর মিথ্যা—এই-জাতীয় ধারণা কুসংস্কার, এগুলি অতীতের গর্ভেই বিলীন হওয়া উচিত। এই ধরনের ধারণাগুলি অবশ্য বর্জনীয়।

মানব-মনের যতই বিস্তার হয়, তাহার আধ্যাত্মিক সোপানগুলিও ততই প্রসার লাভ করে। এমন এক সময় আসিয়াছে, যখন মানুষের চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ হইতে না হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে আমরা শুধু যান্ত্রিক উপায়ে সমগ্র জগতের সংস্পর্শে আসিয়াছি, সুতরাং জগতের ভাবী ধর্মসমূহকে একদিকে যেমন সর্বজনীন, অপরদিকে তেমনি উদার হইতে হইবে।

জগতে যাহা কিছু সৎ ও মহৎ, তাহার সবই ভাবী ধর্মাদর্শের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে উহাতে ভাবী উন্নতির অনন্ত সুযোগ নিহিত থাকিবে। অতীতের যাহা কিছু ভাল, তাহার সবই অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে, এবং পূর্বে সঞ্চিত ধর্মভাণ্ডারে নূতন ভাবসংযোগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। অধিকন্তু প্রত্যেক ধর্মেরই অপর ধর্মগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক; ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় অপরের কোন বিশেষ ধারণাকে ভিন্ন মনে করিয়া নিন্দা করা উচিত নয়। আমার জীবনে আমি এমন অনেক ধার্মিক ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেখিয়াছি, যাঁহাদের ঈশ্বরে—অর্থাৎ আমরা যে-অর্থে ঈশ্বর মানি, সেই ঈশ্বরে আদৌ বিশ্বাস নাই, হয়তো আমাদের অপেক্ষা তাঁহারাই ঈশ্বরকে ভালরূপে বুঝিয়াছেন। ভগবানের সাকার বা নিরাকার রূপ, অসীম সত্তা, নীতিবাদ অথবা আদর্শ মনুষ্য প্রভৃতি যত কিছু মতবাদ আছে, সবই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। সকল ধর্ম যখন এইভাবে উদারতা লাভ করিবে, তখন তাহাদের হিতকারিণী শক্তিও শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। ধর্মসমূহের মধ্যে অতি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকিলেও ঐগুলি শুধু সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার জন্যই মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল অধিক করিয়াছে।

বর্তমান সময়েও আমরা দেখিতে পাই, বহু সম্প্রদায় ও সমাজ প্রায় একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াও পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছে, কারণ এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় যেভাবে করিতেছে ঠিক সেইভাবে নিজের আদর্শগুলি উপস্থাপিত করিতে চায় না। এইজন্য ধর্মগুলিকে উদার হইতে হইবে। ধর্মভাবগুলিকে সর্বজনীন, বিশাল ও অনন্ত হইতে হইবে, তবেই ধর্মের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে, কারণ ধর্মের শক্তি সবেমাত্র পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কখনও কখনও এইরূপ বলিতে শোনা যায় যে, ধর্মভাব পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইতেছে। আমার মনে হয়, ধর্মভাবগুলি সবেমাত্র বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্কীর্ণতামুক্ত ও আবিলতাশূন্য হইয়া ধর্মের প্রভাব মানব-জীবনের প্রতি স্তরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যতদিন ধর্ম মুষ্টিমেয় 'ঈশ্বরনির্দিষ্ট' ব্যক্তিদের বা পুরোহিতকুলের হাতে ছিল, ততদিন উহা মন্দিরে, গীর্জায়, গ্রন্থে, মতবাদে, আচার-অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখনই আমরা ধর্মের যথার্থ আধ্যাত্মিক ও সর্বজনীন ধারণায় উপনীত হইব, তখন এবং কেবল তখনই উহা প্রকৃত ও জীবন্ত হইবে—ইহা আমাদের

স্বভাবে পরিণত হইবে, আমাদের প্রতি গতিবিধিতে প্রাণবন্ত হইয়া থাকিবে, সমাজের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিবে এবং পূর্বাপেক্ষা অনন্তগুণ কল্যাণকারিণী শক্তি হইবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের উত্থান বা পতনের প্রশ্ন যখন একসঙ্গে গ্রথিত, তখন প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদা হইতে উদ্ভূত সৌভ্রাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে অনেক ধর্ম যেভাবে অপর ধর্মের প্রতি সানুগ্রহ, কৃপাপূর্ণ ও কৃপণোচিত সদিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা চলিবে না। সর্বোপরি দুই প্রকার বিশেষ মতবাদের মধ্যে এই ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; ইহার মধ্যে প্রথম দলের ধর্মের বিবিধ বিকাশ মনস্তত্ত্বের আলোচনা হইতে উদ্ভূত হয়; দুরদৃষ্টবশতঃ এই দল এখনও দাবী করেন যে, তাঁহাদের ধর্মই একমাত্র ‘ধর্ম’ নামের যোগ্য। দ্বিতীয় আর একদল আছেন, যাঁহাদের মস্তিষ্ক স্বর্গের আরও রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহাদের পদতল মাটি আঁকড়াইয়া থাকে—এখানে আমি তথাকথিত জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের কথাই বলিতেছি।

এই সমন্বয় আনিতে হইলে উভয়কে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে; কখনও এই ত্যাগ একটু বেশী রকমের দরকার, এমন কি কখনও যন্ত্রণাদায়কও হইতে পারে, কিন্তু এই ত্যাগের ফলে প্রত্যেক দল নিজেকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত ও সত্যে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবেন। এবং পরিণামে যে-জ্ঞানকে দেশ ও কালের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন রাখা হইয়াছে, তাহা পরস্পর মিলিত হইয়া দেশকালাতীত এমন এক সত্তার সহিত একীভূত হইবে, যেখানে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ যাইতে অক্ষম, যাহা সর্বাতীত, অনন্ত ও ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ ।

৩. যুক্তি ও ধর্ম

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

নারদ নামে এক ঋষি সত্যলাভের জন্য সনৎকুমার নামক আর একজন ঋষির কাছে গিয়াছিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ কোন্ বিষয় ইতোমধ্যে অধ্যয়ন করিয়াছ?' নারদ বলিলেন, 'বেদ, জ্যোতিষ এবং আরও বহু বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তৃপ্ত হইতে পারি নাই।' আলাপ চলিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে সনৎকুমার বলিলেনঃ বেদ জ্যোতিষ ও দর্শন-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা গৌণ; বিজ্ঞানগুলিও গৌণ। যাহা দ্বারা আমাদের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, তাহাই চরম জ্ঞান—সর্বোচ্চ জ্ঞান। এই ধারণাটি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই দেখা যায়, এবং ঐজন্যই সর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া ধর্মের দাবী চিরন্তন। বিজ্ঞানগুলির জ্ঞান যেন আমাদের জীবনের একটুখানি অংশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু ধর্ম আমাদের কাছে যে জ্ঞান লইয়া আসে, তাহা চিরন্তন; ধর্ম যে সত্যের কথা প্রচার করে, সে সত্যের মত এ জ্ঞানও সীমাহীন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী লইয়া ধর্ম বারবার সর্ববিধ জাগতিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়াছে, শুধু তাহাই নয়, জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সমর্থিত হইতেও বহুবার অস্বীকার করিয়াছে। ফলে জগতের সর্বত্র ধর্মজ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞানের মধ্যে একটা বিরোধ লাগিয়াই আছে। একপক্ষ আচার্য, শাস্ত্র প্রভৃতির অভ্রান্ত প্রমাণকে পথ-নির্দেশক বলিয়া দাবী করিয়াছে এবং এ-বিষয়ে জাগতিক জ্ঞানের যাহা বলিবার আছে, তাহার কিছুতেই কান দিতে চায় নাই। অপর পক্ষ যুক্তিরূপ শাণিত অস্ত্র দ্বারা ধর্ম যাহা কিছু বলিতে চায় তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এই সংগ্রাম চলিয়াছে, এবং এখনও চলিতেছে। ধর্ম বারবার পরাজিত ও প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। মানুষের ইতিহাসে 'যুক্তি-দেবতার উপাসনা' ফরাসী-বিপ্লবের সময়েই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে নাই; এই জাতীয় ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছিল, ফরাসী-বিপ্লবের সময় উহার পুনরভিনয় মাত্র হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে উহা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। জড়বিজ্ঞানগুলি এখন পূর্বাপেক্ষা আরও

ভালভাবে প্রস্তুত হইয়াছে; আর ধর্মের প্রস্তুতি সে-তুলনায় কমিয়া গিয়াছে, ভিত্তিগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আর আধুনিক মানুষ প্রকাশ্যে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে এ-বোধ জাগ্রত যে, সে আর 'বিশ্বাস' করিতে পারে না। আধুনিক যুগের মানুষ জানে যে, পুরোহিত-সম্প্রদায় তাহাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে বলিয়াই, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়াই, কিংবা তাহার স্বজনেরা চাহিতেছে বলিয়াই কিছু বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য এমন কিছু লোক আছে, যাহারা তথাকথিত জনপ্রিয় বিশ্বাসকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-কথাও আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করে না। তাহাদের বিশ্বাসের ভাবটিকে 'চিন্তাহীন অনবধানতা' আখ্যা দেওয়া চলে। এই সংগ্রাম এভাবে আর বেশীদিন চলিতে পারে না; চলিলে ধর্মের সব সৌধই ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন হইল—ইহা হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় আছে কি? আরও স্পষ্টভাবে বলিলে বলিতে হয়ঃ অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যে-সকল আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম-সমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে? বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে? আমার মতে তাহাই হওয়া উচিত। আমি ইহাও মনে করি, যত শীঘ্র তা হয়, ততই মঙ্গল। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সেই ধর্ম বরাবরই অনাবশ্যক কুসংস্কার-মাত্র ছিল; যতশীঘ্র উহা লোপ পায়, ততই মঙ্গল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উহার বিনাশেই সর্বাধিক কল্যাণ। এই অনুসন্ধানের ফলে ধর্মের ভিতর যা-কিছু খাদ আছে, সে-সবই দূরীভূত হইবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু ধর্মের যাহা সারভাগ, তাহা এই অনুসন্ধানের ফলে বিজয়-গৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে অন্ততঃ ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হইবে শুধু তাহাই নয়, বরং আরও বেশী জোরালো হইবে; কারণ জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দিবার মত অভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নাই, কিন্তু ধর্মের তাহা আছে।

যে-সব ব্যক্তি ধর্ম সম্বন্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত তত্ত্বানুসন্ধানের উপযোগিতা অস্বীকার করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা যেন কতকটা স্ববিরোধী কাজ করিয়া থাকেন। যেমন খ্রীষ্টানরা দাবী করেন যে, তাঁহাদের ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম; কারণ অমুক-অমুক ব্যক্তির কাছে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। মুসলমানরাও নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে একই দাবী জানান যে, একমাত্র তাঁহাদের ধর্মই সত্য, কারণ এই এই ব্যক্তির কাছে তাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বলেন, 'তোমাদের নীতিশাস্ত্রের কয়েকটি বিষয় ঠিক বলিয়া মনে হয় না। একটা উদাহরণ দিই। দেখ, ভাই মুসলমান, তোমার শাস্ত্র বলে যে, কাফেরকে জোর করিয়া মুসলমান করা চলে; আর সে যদি মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইতে না চায়, তবে তাহাকে হত্যা করাও চলে। আর এরূপ কাফেরকে যে-মুসলমান হত্যা করে, সে যত পাপ, যত গর্হিত কর্মই করুক না কেন, তাহার স্বর্গলাভ হইবেই।' মুসলমানরা ঐ-কথার উত্তরে বিদ্রূপ করিয়া বলিবে, 'ইহা যখন শাস্ত্রের আদেশ, তখন আমার পক্ষে এরূপ করাই সঙ্গত। এরূপ না করাটাই আমার পক্ষে অন্যায়।' খ্রীষ্টানরা বলিবে, 'কিন্তু আমাদের শাস্ত্র এ-কথা বলে না।' মুসলমানরা তাহার উত্তরে বলিবে, 'তা আমি জানি না। তোমার শাস্ত্র-প্রমাণ মানিতে আমি বাধ্য নই। আমার শাস্ত্র বলে, সব কাফেরকে হত্যা কর। কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল, তাহা তুমি জানিলে কিরূপে? আমার শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, নিশ্চয়ই তাহা সত্য। আর তোমার শাস্ত্রে যে আছে, হত্যা করিও না, তাহা ভুল। ভাই খ্রীষ্টান, তুমিও তো এই কথাই বল; তুমি বল যে, যিহোবা য়াহুদীদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ কর্তব্য; আর তিনি তাহাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা করা অন্যায়। আমিও তাহাই বলি; কতকগুলি বিষয়কে কর্তব্য বলিয়া এবং কতকগুলি বিষয়কে অকর্তব্য বলিয়া আল্লা আমার শাস্ত্রে অনুজ্ঞা দিয়াছেন; ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ের তাহাই চূড়ান্ত প্রমাণ।' খ্রীষ্টানরা কিন্তু ইহাতেও খুশী নয়। তাহারা 'শৈলোপদেশ' - এর (Sermon on the Mount) নীতির সহিত কোরানের নীতি তুলনা করিয়া দেখাইবার জন্য জিদ করিতে থাকে। ইহার মীমাংসা হইবে কিরূপে? গ্রন্থের দ্বারা নিশ্চয়ই নয়, কারণ পরস্পর বিবদমান গ্রন্থগুলি বিচারক হইতে পারে না। কাজেই এ-কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই-সব গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বজনীন

কিছু একটা আছে; একটা কিছু আছে, যাহা জগতে যত নীতিশাস্ত্র আছে, সেগুলি অপেক্ষা উচ্চতর; একটা কিছু আছে, যাহা বিভিন্ন জাতির অনুপ্রেরণা-শক্তিগুলিকে পরস্পর তুলনা করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারে। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি আর নাই করি, পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, বিচারের জন্য আবেদন লইয়া আমরা যুক্তির দ্বারস্থ হই।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছেঃ এই যুক্তির আলোক অনুপ্রেরণাগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিতে সমর্থ কিনা; যেখানে আচার্যের সহিত আচার্যের বিরোধ, সেখানেও যুক্তি নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে কিনা এবং ধর্ম-সংক্রান্ত সব বিষয়ই বুঝিবার সামর্থ্য তাহার আছে কিনা। যদি না থাকে, তবে আচার্যে আচার্যে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে যে জঘন্য বিরোধ যুগযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, কোন কিছু দ্বারাই তাহার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়; কারণ তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সব ধর্মই শুধু মিথ্যা ও অতিমাত্রায় পরস্পর-বিরোধী এবং সেগুলির মধ্যে নীতির কোন স্থায়ী মান নাই। ধর্মের প্রমাণ মানুষের প্রকৃতিগত সত্যের উপর নির্ভর করে, কোন গ্রন্থের উপর নয়। গ্রন্থগুলি তো মানুষের প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ, তাহার পরিণাম। মানুষই এই গ্রন্থগুলির স্রষ্টা। মানুষকে গড়িয়াছে, এমন কোন গ্রন্থ এখনও আমাদের নজরে পড়ে নাই। যুক্তিও সমভাবে সেই সাধারণ কারণের, মনুষ্য-প্রকৃতির একপ্রকার বিকাশ। এই মনুষ্য-প্রকৃতির কাছেই আমাদের আবেদন জানাইতে হইবে। তবু একমাত্র যুক্তিই এই মানব-প্রকৃতির সহিত সরাসরি সংযুক্ত; সেজন্য যতক্ষণ তাহা মানব-প্রকৃতির অনুগামী হয়, ততক্ষণ যুক্তিরই আশ্রয় লওয়া উচিত। যুক্তি বলিতে আমি কি বুঝাইতে চাহিতেছি? আধুনিক কালের প্রত্যেক নর-নারী যাহা করিতে চায়, আমি তাহাই বলিতে চাহিতেছি—জাগতিক জ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে বলিতেছি। যুক্তির প্রথম নিয়ম এই যে, বিশেষ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, সাধারণ জ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় আরও ব্যাপক সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা; যতক্ষণ না আমরা বিশ্বজনীনতায় গিয়া পৌঁছাই, ততক্ষণ এইভাবেই চলিতে হয়। যেমন, নিয়ম বলিতে কি বুঝায় সে ধারণা আমাদের আছে। একটা কিছু ঘটিলে আমাদের যদি বিশ্বাস হয় যে, কোন একটি নিয়মের ফলেই তাহা

ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা তৃপ্ত হই; আমাদের কাছে উহাই কার্যটির ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা-অর্থে আমরা ইহাই বুঝাইতে চাইঃ যে কার্যটি দেখিয়া আমরা অতৃপ্ত ছিলাম, এখন প্রমাণ পাইলাম যে, এই ধরনের হাজার হাজার কার্য ঘটিয়া থাকে; এটি সেই সাধারণ কার্যের অন্তর্গত একটি বিশেষ কার্য মাত্র। ইহাকেই আমরা 'নিয়ম' বলি। একটি আপেল পড়িতে দেখিয়া নিউটনের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, সব আপেলই পড়ে, মাধ্যাকর্ষণের জন্য ইহা ঘটে, তখন তিনি তৃপ্ত হইলেন। মানুষের জ্ঞানের ইহা একটি নিয়ম। আমি কোন বিশেষ জিনিষকে—একটি মানুষকে রাস্তায় দেখিলাম; মানুষ সম্বন্ধে বৃহত্তর ধারণার সহিত তাহার তুলনা করিলাম এবং তৃপ্ত হইলাম; বৃহত্তর সাধারণের সহিত তুলনা করিয়া আমি তাহাকে মানুষ বলিয়া জানিলাম। কাজেই বিশেষকে বুঝিতে হইলে সাধারণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে, সাধারণকে বৃহত্তর সাধারণের সঙ্গে এবং সবশেষে সব-কিছুকে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে। অস্তিত্বের ধারণাই আমাদের সর্বশেষ ধারণা, সর্বাধিক বিশ্বজনীন ধারণা। অস্তিত্বই হইল বিশ্বজনীন বোধের চূড়ান্ত।

আমরা সবাই মানুষ; ইহার অর্থ—মনুষ্যজাতি-রূপ যে সাধারণ ধারণা, আমরা যেন তাহার অংশ-বিশেষ। মানুষ, বিড়াল, কুকুর—এ-সবই প্রাণী। মানুষ, কুকুর, বিড়াল—এই-সব বিশেষ উদাহরণগুলি প্রাণিরূপ বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধারণ জ্ঞানের অংশ। মানুষ, বিড়াল, কুকুর, লতা, বৃক্ষ—এ-সবই আবার জীবন-রূপ আরও ব্যাপক ধারণার অন্তর্ভুক্ত। এগুলিকে এবং সব জীব, সব পদার্থকেই আবার অস্তিত্বরূপ একটি ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা যায়; কারণ আমরা সবাই সেই ধারণার মধ্যে পড়ি। এই ব্যাখ্যা বলিতে শুধু বিশেষজ্ঞানকে সাধারণজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা এবং আরও কিছু সমধর্মী বিষয়ের সন্ধান করা বোঝায়। মন যেন তাহার ভাণ্ডারে এই ধরনের অসংখ্য সাধারণজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। মনের মধ্যে যেন অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে, সেগুলির মধ্যে এই-সব ধারণা ভাগে-ভাগে সাজান থাকে; আর যখনই আমরা কোন নূতন জিনিষ দেখি, মন তৎক্ষণাৎ এই প্রকোষ্ঠগুলির কোন একটি হইতে তাহার অনুরূপ জিনিষ বাহির করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। যদি কোন খোপে আমরা অনুরূপ জিনিষ খুঁজিয়া পাই, তবে নূতন জিনিষটিকে সেই

খোপে রাখিয়া দিই। আমরা তখন তৃপ্ত হই ও ভাবি, জিনিষটি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলাম। জ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝায়, ইহার বেশী কিছু নয়। মনের কোন খোপে অনুরূপ জিনিষ দেখিতে না পাইলে আমরা অতৃপ্ত হই। ইহার জন্য মনের মধ্যে পূর্ব হইতেই বর্তমান এমন একটি শ্রেণীবিভাগ খুঁজিয়া বাহির না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হয়। কাজেই জ্ঞান বলিতে শ্রেণীবিভাগ বুঝায়; এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাছাড়া আরও আছে। জ্ঞানের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, কোন বস্তুর ব্যাখ্যা অবশ্যই উহার ভিতর হইতে আসা চাই, বাহির হইতে নয়। একখণ্ড পাথর উপরে ছুঁড়িয়া দিলে উহা আবার নীচে পড়িয়া যায় কেন? লোকে এরূপ বিশ্বাস করিত যে, কোন দৈত্য সেটিকে টানিয়া নামাইয়া আনে। বহু ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল যে, সেগুলি কেহ অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে ঘটায়; আসলে কিন্তু সেগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত পাথরকে একজন দৈত্য টানিয়া নামায়, এই ব্যাখ্যাটি পাথর-বস্তুটির ভিতর হইতে আসিত না, আসিত বাহির হইতে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য পাথরটি পড়িয়া যায়, এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু পাথরের স্বভাবগত গুণবিশেষ; এই ব্যাখ্যাটি বস্তুর অভ্যন্তর হইতে আসিতেছে। দেখা যায়, এভাবে ব্যাখ্যা করার ঝোঁক আধুনিক চিন্তার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এক কথায় বলা যায়, বিজ্ঞান বলিতে বোঝায় যে, বস্তুর ব্যাখ্যা তাহার প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে; বিশ্বের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য বাহিরের কোন ব্যক্তি বা অস্তিত্বকে টানিয়া আনার প্রয়োজন হয় না। রাসায়নিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য রসায়নবিদের কোন দানব বা ভূত-প্রেত বা এই ধরনের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। কোন পদার্থবিদের বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের কাছেও তাঁহাদের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য এই-সব দৈত্য-দানবাদির কোন প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের এটি একটি ধারা; এই ধারাটি আমি ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে চাই। দেখা যায়, ধর্মগুলির মধ্যে ইহার অভাব রহিয়াছে এবং সেইজন্য ধর্মগুলি ভাঙিয়া শতধা হইতেছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান অভ্যন্তর হইতেই—বস্তুর প্রকৃতি হইতেই ব্যাখ্যা চায়; ধর্মগুলি কিন্তু তাহা দিতে পারিতেছে না। একটি মত আছে যে, ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষ এবং তিনি বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক সত্তা; এই ধারণা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান। ইহার সপক্ষে বারবার এই যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে যে বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, অতিপ্রাকৃতিক

একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন রহিয়াছে; এই ঈশ্বর ইচ্ছামাত্র বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ধর্ম বিশ্বাস করে, তিনিই বিশ্বের নিয়ন্তা। এ-সব যুক্তি তো আছেই, তাছাড়া দেখা যায় সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সকলের প্রতি করুণাময় বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন; এদিকে আবার সেই সঙ্গে জগতে বৈষম্যও রহিয়াছে। দার্শনিক এ-সব লইয়া মোটেই মাথা ঘামান না; তিনি বলেন, ইহার গোড়ায় গলদ রহিয়াছে—এই ব্যাখ্যা বাহির হইতে আসিতেছে, ভিতর হইতে নয়। বিশ্বের কারণ কি? বাহিরের কোন কিছু—কোন ব্যক্তি এই বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন! শূন্যে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের নিম্নে পতনরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন এরূপ ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, ধর্মের ব্যাখ্যাতেও ঠিক তাই। ধর্মগুলি ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে, কারণ ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা তাহারা দিতে পারে না।

প্রত্যেক বস্তুর ব্যাখ্যা উহার ভিতর হইতেই আসে, এই ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি ধারণা হইল আধুনিক বিবর্তনবাদ; দুইটি ধারণাই একই মূল তত্ত্বের অভিব্যক্তি। সমগ্র বিবর্তনবাদের সরল অর্থ—বস্তুর স্বভাব পুনঃপ্রকাশিত হয়; কারণের অবস্থান্তর ছাড়া কার্য আর কিছুই নয়, কার্যের সম্ভাবনা কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে; সমগ্র বিশ্বই তাহার মূল সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র, শূন্য হইতে সৃষ্ট নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্যই তাহার পূর্ববর্তী কোন কারণের পুনরভিব্যক্তি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শুধু তাহার অবস্থান্তর ঘটে। সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া ইহাই ঘটিতেছে, কাজেই এই-সব পরিবর্তনের কারণ খুঁজিতে আমাদের বিশ্বের বাহিরে হাতড়াইবার প্রয়োজন নাই; বিশ্বের ভিতরেই সেই কারণ বর্তমান। বাহিরে কারণ খোঁজা নিষ্প্রয়োজন। এই ধারণাটিও ধর্মকে ভূমিসাৎ করিতেছে। যে-সব ধর্ম বিশ্বাতিরিক্ত একজন ঈশ্বরকে আঁকড়াইয়া ছিল, তিনি খুব বড় একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন; এই ধারণা এখন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যেন জোর করিয়া টানিয়া এ ধারণাকে ভূপাতিত করা হইতেছে; ধর্মকে ভূমিসাৎ করা হইতেছে বলিতে আমি ইহাই বুঝাইতেছি।

এই দুইটি মূলতত্ত্বকে তৃপ্ত করিতে পারে, এমন কোন কর্ম থাকিতে পারে কি? আমার মনে হয়, পারে। আমরা দেখিয়াছি, সর্বপ্রথমে সামান্যীকরণের মূলতত্ত্বগুলিকে তৃপ্ত করিতে হইবে। সামান্যীকরণের তত্ত্বগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনবাদের তত্ত্বগুলিকেও তৃপ্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে এমন একটি চরম সামান্যীকরণে আসিতে হইবে, যাহা শুধু

সামান্যীকরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিশ্বব্যাপকই হইবে না, বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভবও তাহা হইতে হওয়া চাই। উহাকে নিম্নতম কার্যের সহিত সমপ্রকৃতির হইতে হইবে; যাহা কারণ, যাহা সর্বোচ্চ, যাহা চরম—যাহা আদি কারণ, তাহাকে পরম্পরাগত কতকগুলি অভিব্যক্তির ফলে সঞ্জাত দূরতম, নিম্নতম কার্যের সহিতও ভিন্ন হইতে হইবে। বেদান্তের ব্রহ্মই এই শর্ত পূরণ করেন; কারণ সামান্যীকরণ করিতে করিতে সর্বশেষে আমরা গিয়া যেখানে পৌঁছিতে পারি, এই ব্রহ্ম তাহাই। এই ব্রহ্ম নির্গুণ—অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের চরম অবস্থা (সচ্চিদানন্দস্বরূপ)। আমরা দেখিয়াছি, মনুষ্য-মন যে চরম সামান্যীকরণে পৌঁছিতে পারে, তাহাই 'অস্তিত্ব' (সৎ)। জ্ঞান (চিৎ) বলিতে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা বুঝায় না; ইহা সেই জ্ঞানের নির্যাস বা সূক্ষ্মতম অবস্থা; ইহাই ক্রম-অভিব্যক্ত হইয়া মানুষ বা অপর প্রাণীর মধ্যে জ্ঞানরূপে ফুটিয়া উঠে। বিশ্বের পিছনে যে চরম সত্তা রহিয়াছে—কাহারও আপত্তি না থাকিলে বলিতে পারি—এমন কি চেতনারও পিছনে যাহা রহিয়াছে, জ্ঞানের সূক্ষ্মসত্তা বলিতে তাহাই বুঝায়। 'চিৎ' বলিতে এবং বিশ্বের বস্তুসমূহের সত্তাগত একত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, উহা তাহাই। আমার মনে হয়, আধুনিক বিজ্ঞান বার বার যাহা প্রমাণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা এইঃ আমরা এক; মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক—সব দিক্ দিয়াই আমরা এক। শরীরের দিক্ হইতে আমরা পৃথক্, এ-কথাও বলা ভুল। তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইতেছি, আমরা জড়বাদী; সে ক্ষেত্রেও আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সমগ্র বিশ্ব একটা জড়-সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়, আর সেই জড়-সমুদ্রে তুমি আমি যেন ছোট ছোট ঘূর্ণি। খানিকটা জড়পদার্থ প্রত্যেক ঘূর্ণির স্থানে আসিয়া ঘূর্ণির আকার লইতেছে, আবার জড়পদার্থরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে, আমার শরীরে যে জড়পদার্থ আছে, কয়েক বছর পূর্বে তাহা হয়তো তোমার শরীরে ছিল বা সূর্যে ছিল বা হয়তো অন্য কোন গ্রহে বা অন্য কোথাও ছিল—অবিরাম গতিশীল অবস্থায় ছিল। তোমার দেহ, আমার দেহ—এ-কথার অর্থ কি? দেহ সবই এক। চিন্তার বেলাও তাই। চিন্তার একটি অসীম-প্রসারী সমুদ্র রহিয়াছে; তোমার মন, আমার মন সেই সমুদ্রেরই ভিতর দুইটি ঘূর্ণিবিশেষ। উহার ফল কি এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছ না? তোমার চিন্তা আমার মনে এবং আমার চিন্তা তোমার মনে প্রবেশ করিতেছে কি করিয়া? আমাদের

সমস্ত জীবনই এক; আমরা এক, এমন কি চিন্তার দিক্ দিয়াও এক। সামান্যীকরণের দিকে আরও অগ্রসর হইলে পাওয়া যায় জড়বস্তু ও চিন্তার সূক্ষ্মসত্তা আত্মাকে, যাহা হইতে উহারা অভিব্যক্ত হইতেছে; এই একত্ব হইতেই সবকিছু আসিয়াছে, সত্তার দিক্ হইতে সেগুলিকে এক হইতেই হইবে। আমরা সর্বতোভাবে এক, শরীর ও মনের দিক্ দিয়া এক; আর আত্মায় যদি আমাদের আদৌ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আত্মার দিক্ হইতেও যে আমরা এক, এ-কথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রতিদিনই এই একত্বের কথা প্রমাণিত হইয়া চলিয়াছে। গর্বিত লোককে বলা হয়ঃ তুমিও যা, ঐ ক্ষুদ্র পোকাটিও তাই; তোমার ও উহার মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, এ-কথা ভাবিও না। উহার সঙ্গে তুমি এক। পূর্বজন্মে তুমিও একদিন ঐরকম পোকা ছিলে; পোকাই ক্রমোন্নত হইতে হইতে কালে এই মানুষ হইয়াছে, যে-মনুষ্যত্বের গর্বে তুমি এত গর্বিত! বস্তুর একত্বরূপ এই অপূর্ব তথ্যটি—যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহারই সহিত আমাদের এক করিয়া দেয়। এ তথ্যটি একটি মহান্ শিক্ষার বিষয়; কারণ আমাদের ভিতর অধিকাংশ লোকই উচ্চতর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক করিতে পারিলে খুশী হয়। কিন্তু কেহই নিম্নতর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া ভাবিতে চায় না। কাহারও পূর্বপুরুষ পশুতুল্য, দস্যু বা দস্যু-জমিদার হওয়া সত্ত্বেও যদি সমাজ-কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, তবে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে তাঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার সহিত একটা সম্পর্ক খুঁজিতে তৎপর হই; মানুষের এমনই নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি সৎ এবং ভদ্র হইলেও আমরা কেহই তাঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে চাই না। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে, সত্য ক্রমেই অধিকতর প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। আর তাহাতে ধর্মের লাভ যথেষ্ট। আমি যে-বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছি, সেই অদ্বৈততত্ত্ব ঠিক এই কথাই বলে। বিশ্বের মূল সত্তা ব্রহ্মই সব জীবাত্মার স্বরূপ। তিনিই তোমার জীবনের পরম ধন; তাই বা বলি কেন, তুমিই তিনি—'তত্ত্বমসি'। বিশ্বের সঙ্গে তুমি এক। যে বলে অপরের সহিত তাহার এতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে, সে তখনই দুঃখী হয়। এই একত্বের বোধ সম্বন্ধে যে সচেতন, সে নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে এক বলিয়া জানে, সে-ই সুখের অধিকারী।

কাজেই দেখা যাইতেছে, উচ্চতম সামান্যীকরণ এবং বিবর্তনবাদের কথা বেদান্তে আছে বলিয়া বেদান্তের ধর্ম বৈজ্ঞানিক জগতের দাবী মিটাইতে পারে। কোন বস্তুর ব্যাখ্যা যে তাহার ভিতর হইতেই আসে, বেদান্ত সে কথা আরও সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেয়। ব্রহ্মের বা বেদান্তোক্ত ভগবানের বাহিরে তদতিরিক্ত কোন সত্তা নাই, একেবারেই নাই। আসলে সবই তিনি, বিশ্বের মধ্যে তিনিই রহিয়াছেন; তিনিই বিশ্ব। 'তুমিই নর, তুমিই নারী; যৌবন-মদ-দৃপ্তপদে বিচরণকারী যুবক তুমিই, স্খলিত-পদ বৃদ্ধও তুমি।'৬ এই এখানেই তিনি আছেন। আমরা তাঁহাকেই দেখি, তাঁহাকেই অনুভব করি। তাঁহাতেই আমরা বাঁচিয়া থাকি ও বিচরণ করি; তাঁহার অস্তিত্বেই আমাদের অস্তিত্ব। (বাইবেলের) 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'-এর ভিতর আমরা এই ভাব দেখিতে পাই। সেই একই ভাব—ভগবান্ বিশ্বে ওতপ্রোত। তিনিই বস্তুর মূল সত্তা, বস্তুর হৃদয়-স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ। বিশ্বে তিনি যেন নিজেকেই অভিব্যক্ত করেন। সেই অসীম সচ্চিদানন্দ-সাগরের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি; তুমি আমি যেন সেই সাগরেরই ক্ষুদ্র অংশ, ক্ষুদ্র বিন্দু, ক্ষুদ্র প্রণালী, ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি। বস্তুর দিক্ দিয়া মানুষে-মানুষে, দেবতায়-মানুষে, মানুষে-প্রাণীতে, প্রাণীতে-উদ্ভিদে, উদ্ভিদে-পাথরে কোন পার্থক্য নাই। কারণ সর্বোচ্চ দেবদূত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন ধূলিকণা পর্যন্ত—সবই সেই এক সীমাহীন সাগরের অভিব্যক্তি। তফাত শুধু প্রকাশের তারতম্যে। আমার মধ্যে প্রকাশ খুব কম, তোমার মধ্যে হয়তো তার চেয়ে বেশী; কিন্তু উভয়ের বস্তু সেই একই। তুমি আমি সেই একই অনন্ত অস্তিত্ব-সাগরে অবস্থিত—উহারই দুইটি ক্ষুদ্র অংশ, ক্ষুদ্র নির্গত পথ বা ক্ষুদ্র প্রকাশ মাত্র। কাজেই ঈশ্বরই তোমার স্বরূপ, আমারও স্বরূপ। জন্ম হইতেই তুমি স্বরূপতঃ ঈশ্বর, আমিও তাহাই। তুমি হয়তো পবিত্রতার মূর্তি দেবদূত, আর আমি হয়তো মহাদুষ্কৃতিকারী দানব। তা সত্ত্বেও সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে আমার জন্মগত অধিকার আছে, তোমারও আছে। তুমি আজ নিজেকে অনেক বেশী মাত্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছ। অপেক্ষা কর, আমি নিজেকে আরও বেশী অভিব্যক্ত করিব; কারণ সবই তো আমার ভিতরে রহিয়াছে। কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; কাহারও কাছে কিছু চাহিতে হইবে না। সমগ্র বিশ্বের সমষ্টি হইলেন ঈশ্বর স্বয়ং। ঈশ্বর কি তাহা হইলে জড়পদার্থ? না, নিশ্চয়ই নয়। কারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা ভগবান্‌কে যে-ভাবে

অনুভব করি, তাহাই তো জড়পদার্থ। বুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে যেভাবে অনুভব করি, তাহাই মন। আবার আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বর আত্মারূপেই দৃষ্ট হন। তিনি জড়পদার্থ নন, জড়পদার্থের মধ্যে সত্যবস্তু বলিতে যাহা আছে, তিনি তাহাই। চেয়ারের মধ্যে যাহা সত্যবস্তু, তাহা ভগবানই। কারণ চেয়ারটিকে চেয়াররূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। বাহিরে কিছু একটা ছিল, যাহাকে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আমার নিকট আনিয়াছে; আমার মন তাহার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিয়াছে; আর সেই দুইয়ের সমবায়ে যাহা হইয়াছে, তাহাই হইল চেয়ার। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-নিরপেক্ষ যে সত্তা চিরবিদ্যমান, তাহাই ভগবান্ স্বয়ং। তাঁহারই উপর ইন্দ্রিয়গুলি চেয়ার, টেবিল, ঘর, বাড়ী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সব কিছুই চিত্রিত করিতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে আমরা সকলে একই প্রকার চেয়ার দেখিতেছি কেন? ভগবানের উপর—সচ্চিদানন্দের উপর একইভাবে এইসব বিভিন্ন বস্তু আঁকিয়া চলিতেছি কেন? সকলেই যে একইভাবে অঙ্কিত করে, এমন কথা নয়; তবে যাহারা একই ভাবে আঁকিতেছে, তাহারা সকলেই সত্তার একই স্তরে রহিয়াছে বলিয়া পরস্পরের চিত্রণগুলিকে এবং পরস্পরকে দেখিতে পায়। তোমার আমার মাঝখানে এমন লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা এইভাবে ভগবান্‌কে চিত্রিত করে না। সেই-সব প্রাণী এবং তাহাদের চিত্রিত জগৎ আমরা দেখিতে পাই না। এদিকে আবার আধুনিক পদার্থবিদ্যার গবেষণাগুলি হইতে এ-কথার প্রমাণ ক্রমশঃ বেশী করিয়া পাওয়া যাইতেছে। বস্তুর সূক্ষ্মতর সত্তাই সত্য; যাহা স্থূল, তাহা দৃশ্যমান। সে যাহাই হউক, আমরা দেখিয়াছি, আধুনিক যুক্তির সম্মুখে যদি কোন ধর্মীয় মতবাদ দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহা হইলে একমাত্র অদ্বৈতবাদ; কারণ এখানে আধুনিক যুক্তির দুইটি দাবী পূর্ণ হয়, ইহাই সর্বোচ্চ সামান্যীকরণ; এই সামান্যীকরণ ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে, ইহা প্রত্যেক জীবের পক্ষেই সাধারণ। যে সামান্যীকরণ সাকার ঈশ্বরে শেষ হয়, তাহা বিশ্বজনীন হইতে পারে না; কারণ সাকার ঈশ্বরের ধারণা করিতে গেলে প্রথমেই তাঁহাকে সর্বতোভাবে দয়াময়—মঙ্গলময় বলিতে হইবে। কিন্তু এই জগৎ ভাল মন্দ উভয়েরই মিশ্রণে গঠিত—ইহার কিছুটা ভাল, কিছুটা মন্দ। আমরা ইহা হইতে কিছুটা বাদ দিয়া বাকী অংশকে সাকার ঈশ্বররূপে সামান্যীকরণ করি। সাকার ঈশ্বর এই-এই রূপ

বলিলে এ-কথাও বলিতে হইবে যে, তিনি এই-এই রূপ নন। আর দেখিবে সাকার ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বদা একটি সাকার শয়তানও আসিয়া পড়িবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সাকার ঈশ্বরের ধারণায় যথার্থ সামান্যীকরণ হয় না; আমাদের আরও আগাইয়া যাইতে হইবে—নিরাকার ব্রহ্মে পৌঁছাইতে হইবে। নিরাকার ব্রহ্মের মধ্যে সুখ-দুঃখ সব লইয়াই বিশ্ব রহিয়াছে, কারণ বিশ্বে যাহা কিছু বর্তমান, সে-সবই ঈশ্বরের সেই নিরাকার স্বরূপ হইতে আসিয়াছে। অমঙ্গল প্রভৃতি সব কিছুই যাঁহার উপর আরোপ করিতেছি, তিনি আবার কি ধরনের ঈশ্বর? কথা হইল, ভালমন্দ—দুই-ই একই জিনিষের বিভিন্ন দিক্, বিভিন্ন প্রকাশ। ভাল ও মন্দ যে দুইটি পৃথক্ সত্তা—এই ভুল ধারণা আদিকাল হইতে রহিয়াছে। ন্যায় ও অন্যায় দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ, উহারা পরস্পরের সহিত সম্পর্করহিত—এই ধারণা, এবং ভাল ও মন্দ দুইটি চির-বিচ্ছেদ্য, চির-বিচ্ছিন্ন পদার্থ—এই ধারণা আমাদের এই জগতের বহু দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে। সর্বদাই ভাল বা সর্বদাই খারাপ, এমন কোন জিনিষ দেখাইয়া দিতে পারে, এরূপ লোকের সাক্ষাৎ পাইলে আমি খুশী হইতাম। যেন কোন ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া খুব ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিবে যে, আমাদের জীবনের কতকগুলি ঘটনা শুধু মঙ্গল আনে, আর কতকগুলি আনে কেবল অমঙ্গল। আজ যাহা মঙ্গলকর, কাল তাহা অমঙ্গলজনক হইতে পারে। আজ যাহা মন্দ, কাল তাহা ভাল হইতে পারে। আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তোমার পক্ষে তাহা অকল্যাণকর হইতে পারে। সিদ্ধান্ত হইল এই যে, অন্যান্য প্রত্যেক জিনিষের মতই ভালমন্দের মধ্যেও বিবর্তন আছে। একটা কিছু আছে, যাহাকে ক্রমবিবর্তনের পথে এক অবস্থায় আমরা ভাল বলি, আবার অন্য অবস্থায় মন্দ বলি। ঝড়ে আমার এক বন্ধু মারা গেল, ঝড়কে আমি অকল্যাণকর বলিলাম, কিন্তু সেই ঝড়ই হয়তো বায়ুর দূষিত বীজাণু নষ্ট করিয়া হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাইল। লোকে ঝড়কে ভাল বলিল, আমি খারাপ বলিলাম। কাজেই ভালমন্দ আপেক্ষিক জগতের অন্তর্গত—ঘটনার অন্তর্গত। যে নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে, তিনি আপেক্ষিক ঈশ্বর নন। কাজেই তাঁহাকে ভাল বা মন্দ কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না, ভাল বা মন্দ কোনটিই নন বলিয়া তিনি এ-সবের অতীত।

অবশ্য তাঁহার অভিব্যক্তি হিসাবে 'মন্দ' অপেক্ষা 'ভাল' তাঁহার স্বরূপের অধিকতর নিকটবর্তী।

এরূপ নিরাকার সত্তা—নির্গুণ ঈশ্বর মানিলে ফল কি হইবে? আমাদের কি লাভ হইবে তাহাতে? আমাদের সান্ত্বনার স্থলরূপে, আমাদের সহায়করূপে ধর্ম কি আর মানবজীবনের অঙ্গরূপে থাকিতে পারিবে? মানুষের কাহারও সাকার ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিবার যে আকূতি রহিয়াছে, তাহার কি হইবে? এ-সবই থাকিবে। সাকার ঈশ্বর থাকিবেন, দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। নিরাকার ব্রহ্মের দ্বারা তিনি আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবেন। আমরা দেখিয়াছি, নিরাকার ঈশ্বরকে বাদ দিয়া সাকার ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। আমরা যদি বলিতে চাই যে, সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একজন ঈশ্বর আছেন, যিনি ইচ্ছামাত্র শূন্য হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে সে-কথা প্রমাণ করিতে পারা যায় না। ইহা অচল। কিন্তু নিরাকারের ভাব ধারণা করিতে পারিলে সেখানে সাকারের ভাবও থাকিতে পারে। সেই একই নিরাকার সত্তাকে বিভিন্নভাবে দেখিলে যাহা মনে হয়, বহু বিচিত্র এই বিশ্ব তাহাই। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যখন তাঁহাকে দেখি, তখন তাঁহাকে জড়জগৎ বলি। এমন কোন প্রাণী যদি থাকিত, যাহার ইন্দ্রিয় পাঁচটিরও বেশী, তবে এই জগৎকেই সে অন্যরূপে দেখিত। আমাদের মধ্যে কাহারও যদি এমন একটি ইন্দ্রিয় হয়, যাহা-দ্বারা সে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তবে এই বিশ্বকেই সে আবার অন্যরূপে দেখিবে। সেই একই অদ্বয় ব্রহ্মের বহু-রূপ, তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দেখার ফলেই বিভিন্ন জগতের ধারণাগুলি উদ্ভূত হয়; মনুষ্য-বুদ্ধিতে সেই নিরাকার সত্তা সম্বন্ধে সর্বোচ্চ যে ধারণা আসা সম্ভব, তাহাই হইল সাকার ঈশ্বর। কাজেই এই চেয়ারটি—এই জগৎ যতখানি সত্য, সাকার ঈশ্বরও ততখানি সত্য; কিন্তু তাহার বেশী নয়। ইহা চরম সত্য নয়। নিরাকার ব্রহ্মই সাকার ঈশ্বর; এইজন্য সাকার ঈশ্বর সত্য। যেমন মানুষ হিসাবে আমি একসঙ্গে সত্য এবং অসত্য দুই-ই। তুমি আমাকে যেভাবে দেখিতেছ, আমি যে তাহাই, এ-কথা সত্য নয়—এ-কথা তুমি নিজেই যাচাই করিয়া দেখিয়া লইতে পার। তুমি আমাকে যাহা বলিয়া মনে কর, আমি তাহা নই; বিচার করিয়া দেখিলে এ-বিষয়ে তুমি তৃপ্ত হইতে পারিবে, কারণ আলো, বিভিন্ন স্পন্দন, বায়ুমণ্ডলের অবস্থা, আমার ভিতরে যাবতীয়

গতি—এই-সবগুলির একত্র মিলনের ফলে আমাকে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তুমি আমাকে সেইরূপই দেখিতেছ। এই অবস্থাগুলির ভিতর যে-কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলেই আমি আবার অন্যরূপ দেখাইব। আলোকের বিভিন্ন অবস্থায় একই মানুষের আলোকচিত্র লইয়া তুমি এ-কথার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পার। কাজেই তোমার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাকে যেমন দেখাইতেছে, ' অমি' বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে। এ-সব সত্ত্বেও আমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার পরিবর্তন নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থাগুলি প্রকাশ পাইতেছে। সেইটিই নৈর্ব্যক্তিক 'আমি', তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হাজার হাজার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 'আমি' ফুটিয়া উঠিতেছে; আমি শিশু ছিলাম, আমি যুবা হইয়াছিলাম, আমি আরও বয়স্ক হইয়া চলিয়াছি। আমার জীবনের প্রতিটি দিনেই আমার দেহের ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এ-সব পরিবর্তন সত্ত্বেও সেগুলির সমষ্টির পরিমাণ কিন্তু চিরস্থির। সেইটিই নৈর্ব্যক্তিক 'আমি'; এই-সব অভিব্যক্তি যেন তাহারই অংশস্বরূপ।

একই ভাবে এই বিশ্বের সমষ্টিফল অপরিবর্তনীয়, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এই বিশ্ব-সংশ্লিষ্ট সব কিছুরই গতি আছে, সব কিছুই অবিরাম স্পন্দনশীল অবস্থায় রহিয়াছে; সব কিছুই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। আবার সেই সঙ্গেই দেখি যে, এই বিশ্ব অনড়; কারণ গতিশব্দটি আপেক্ষিক। চেয়ারটি স্থির, আমি নড়িতেছি; আমার এই গতি ঐ স্থির চেয়ারটির সঙ্গে আপেক্ষিক। গতি-সৃষ্টির জন্য অন্ততঃ দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বকে যদি এক বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সেখানে গতির স্থান নাই। সে যে গতিশীল হইবে, তাহার গতি নির্ধারিত হইবে কিসের সহিত তুলনা করিয়া? কাজেই চরম সত্য অপরিবর্তনীয়, অবিচল। যাহা কিছু গতি ও পরিবর্তন, তাহা সবই ঘটে শুধু এই আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ জগতে। সমষ্টি-সত্তা নৈর্ব্যক্তিক। যাঁহার নিকট আমরা নতজানু হই, প্রার্থনা করি, সেই ভগবান্—সাকার ঈশ্বর, স্রষ্টা বা বিশ্ব-নিয়ন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম অণু পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে। যথেষ্ট যুক্তি দেখাইয়া এরূপ সাকার ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করা যায়। এরূপ সাকার ঈশ্বরকে নিরাকার ব্রহ্মেরই সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। তুমি আমি অতি নিম্নস্তরের প্রকাশ; আমরা যতদূর

ধারণা করিতে পারি, তাহার সর্বোচ্চ প্রকাশ এই সাকার ঈশ্বর। আবার তুমি বা আমি সেই সাকার ঈশ্বর হইতে পারি না। বেদান্ত যখন বলেন, 'তুমি আমি ব্রহ্ম', তখন সেই ব্রহ্ম বলিতে সাকার ঈশ্বর বুঝায় না। একটি উদাহরণ দিতেছি। একতাল কাদা লইয়া একটি প্রকাণ্ড মাটির হাতী গড়া হইল; আবার সেই কাদার সামান্য অংশ লইয়া ছোট একটি মাটির ইঁদুরও গড়া হইল। ঐ মাটির ইঁদুরটি কি কখনও মাটির হাতী হইতে পারিবে? কিন্তু দুইটিকে জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে দুইটিই কাদা হইয়া যায়। কাদা বা মাটি হিসাবে দুইটিই এক; কিন্তু ইঁদুর ও হাতী হিসাবে তাহাদের মধ্যে চিরদিন পার্থক্য থাকিবে। অসীম নিরাকার ব্রহ্ম যেন পূর্বোক্ত উদাহরণের মাটির মত। স্বরূপের দিক্ দিয়া আমরা ও বিশ্বনিয়ন্তা এক, কিন্তু তাঁহার অভিব্যক্তিরূপে, মানুষরূপে আমরা তাঁহার চিরদাস, তাঁহার পূজক। কাজেই দেখা যাইতেছে, সাকার ঈশ্বর থাকিয়া যাইতেছেন। এই আপেক্ষিক জগতের আর সব কিছুও রহিয়া গেল; ধর্মকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইল। কাজেই সাকার ঈশ্বরকে জানিতে গেলে আগে নিরাকার সত্তাকে জানা প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়াছি, তর্কযুক্তির নিয়মানুসারে 'সামান্য'-এর মধ্য দিয়াই শুধু 'বিশেষ'কে জানা যায়। কাজেই যিনি সামান্যীকরণের চরম, সেই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার, নিরাকার ব্রহ্মের মাধ্যমেই শুধু মানুষ হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত সব বিশেষকেই জানা যায়। প্রার্থনা থাকিয়া যাইবে, তাহার অর্থ আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে মাত্র। প্রার্থনার নিম্নস্তরে আছে আমাদের মনের কামনা পূরণের জন্য শুধু 'দাও দাও' ভাব—প্রার্থনা সম্বন্ধে এইসব অর্থহীন ধারণাকে বোধ হয় সরিয়া পড়িতে হইবে। যুক্তিমূলক ধর্মে ঈশ্বরের নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে বলা হয় না; প্রার্থনা করিতে বলা হয় দেবতাদের কাছে। এরূপ হওয়াই খুব স্বাভাবিক। রোমান ক্যাথলিকরা সাধু-সন্তদের কাছে প্রার্থনা করেন; এটি খুব ভাল। কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার কোন অর্থ হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাস লইবার জন্য, একপশলা বৃষ্টি হওয়ার জন্য বা বাগানে সবজি ফলাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা খুবই অস্বাভাবিক। ঈশ্বরের তুলনায় যাঁহারা আমাদেরই মত ক্ষুদ্র জীব, সেই সাধু-সন্তেরা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার নিকট আমাদের ছোটখাট সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার কথা বলা—শিশুকাল হইতেই বলা, 'হে ঈশ্বর, আমার মাথা-ব্যথা সারাইয়া

দাও’—এগুলি নিতান্তই হাস্যকর। জগতে এমন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের আত্মা এখনও রহিয়াছে; তাঁহারা দেবতা ও দেবদূত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সাহায্য করুন না! কিন্তু এজন্য ভগবান্‌কে বলা? নিশ্চয়ই নয়। তাঁহার নিকট চাহিতে হইলে নিশ্চয়ই আরও উচ্চতর জিনিষ চাহিতে হইবে। গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য যে কূপ খনন করে, সে তো মূর্খ, হীরকের খনির কাছে বাস করিয়া যে কাঁচখণ্ডের জন্য মাটি খোঁড়ে, সে মূর্খ ছাড়া আর কি?

করুণাময়, প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট আমরা যদি জাগতিক বস্তু চাহিতে যাই, তবে আমরা নির্বোধ ছাড়া আর কি? কাজেই তাঁহার নিকট জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি প্রার্থনা করিব। কিন্তু যতদিন আমাদের দুর্বলতা আছে, যতদিন ‘তুমি প্রভু, আমি দাস’ এই ভাব লইয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের আছে, ততদিন এ-সব নিম্নস্তরের প্রার্থনাও থাকিবে এবং সাকার ঈশ্বরের উপাসনার ভাবও থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা এ-সব ছোটখাট প্রার্থনার ধার ধারেন না; তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু চাওয়ার কথা, নিজেদের কোন প্রয়োজনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। ‘আমি নই, সখা, তুমি!’—তাঁহাদের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাধান্য। ইঁহারাই নিরাকার উপাসনার যোগ্য ব্যক্তি। নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার অর্থ কি? তাহার অর্থ এরূপ দাসভাব নয়—‘হে প্রভু, আমি অতি অকিঞ্চন, আমায় কৃপা কর!’ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত সেই প্রাচীন পারসী কবিতাটি তো আপনারা জানেনঃ আমি আমার প্রিয়তমকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। আসিয়া দেখি দ্বার রুদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিতেই ভিতর হইতে কেহ বলিল, ‘তুমি কে?’ বলিলাম, ‘আমি অমুক।’ দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আসিয়া করাঘাত করিলাম, একই প্রশ্ন হইল, একই উত্তর দিলাম। সেবারও দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার আসিলাম, একই প্রশ্ন হইল। আমি বলিলাম, ‘প্রিয়তম, আমি তুমিই!’ তখন দ্বার খুলিয়া গেল। সত্যের মাধ্যমে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। সত্য কি? আমিই তিনি। আমি ‘তুমি’ নই—এ-কথা বলিলে অসত্য বলা হয়। তোমা হইতে আমি পৃথক্‌, এ কথার মত মিথ্যা, ভয়ঙ্কর মিথ্যা আর নাই। এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক, জন্ম হইতেই এক। বিশ্বের সঙ্গে আমি যে এক, তাহা আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমার

চারিদিকে যে বায়ু রহিয়াছে, তাহার সহিত আমি এক, তাপের সঙ্গে এক, আলোর সঙ্গে এক; যাঁহাকে বিশ্ব বলা হয়, যাঁহাকে অজ্ঞানবশতঃ বিশ্ব বলিয়া মনে হয়, সেই সর্বব্যাপী বিশ্বদেবতার সঙ্গে আমি অনন্তকাল এক, কারণ হৃদয়ে যিনি চিরন্তন কর্তা, প্রত্যেকের হৃদয়াভ্যন্তরে যিনি বলেন, 'আমি আছি', যিনি মৃত্যুহীন চিরজাগ্রত অমর, যাঁহার মহিমার নাশ নাই, যাঁহার শক্তি চির-অব্যর্থ, তিনিই এই বিশ্বদেবতা, অপর কেহই নয়। তাঁহার সহিত আমি এক।

ইহাই নিরাকার উপাসনার সার। এই উপাসনার কি ফল হয়? ইহাতে মানুষের গোটা জীবনটাই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। আমাদের জীবনে যে-শক্তির একান্ত প্রয়োজন, ইহাই সেই শক্তি। কারণ যাহাকে আমরা পাপ বলি, দুঃখ বলি, তাহার একটিমাত্র কারণ আছে—আমাদের দুর্বলতাই সেই কারণ। দুর্বলতার সঙ্গে অজ্ঞান আসে, অজ্ঞানের সঙ্গে আসে দুঃখ। নিরাকারের উপাসনা আমাদিগকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিবে। আমরা তখন দুঃখকে, হীনতার উগ্রতাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিব; হিংস্র ব্যাঘ্র তখন তাহার ব্যাঘ্র-স্বরূপের পিছনে আমার নিজেরই আত্মাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবে। নিরাকার উপাসনার ফল এই হইবে। ভগবানের সহিত যাঁহার আত্মা এক হইয়া গিয়াছে, তিনিই শক্তিমান; তাছাড়া আর কেহই শক্তিমান্ নয়। নাজারেথের যীশুর যে-শক্তির কথা তোমাদের বাইবেলে আছে, যে প্রচণ্ড শক্তিবলে বিশ্বাসঘাতককে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে যাহারা হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদেরও তিনি আশীর্বাদ করিয়াছেন, সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল? তোমাদের কি মনে হয়? এই শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল এই বোধ হইতে—'আমি ও আমার পিতা এক'; এই শক্তির কারণ এই প্রার্থনা—'পিতা, আমি যেমন তোমার সঙ্গে এক, সেইরূপ ইহাদের সকলকেই আমার সহিত এক করিয়া দাও।' ইহাই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা। বিশ্বের সহিত এক হইয়া যাও, তাঁহার সহিত এক হইয়া যাও। আর, এই নিরাকার ব্রহ্মের কোন বাহ্য প্রকাশের—কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা, নিজ নিজ চিন্তা অপেক্ষা তিনি আমাদের আরও নিকটে। তিনি আছেন বলিয়াই তাঁহার মাধ্যমে আমরা দেখি ও চিন্তা করি। কোন কিছু দেখিবার পূর্বে তাঁহাকেই দেখিতে হইবে। এই দেওয়ালটি দেখিতে হইলে পূর্বে তাঁহাকে দেখি, তারপর দেখি দেওয়ালটিকে; কারণ

চিরকাল সব ক্রিয়ারই কর্তা তিনি। কে কাহাকে দেখিতেছে? তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রহিয়াছেন। দেহ ও মনের পরিবর্তন হয়; সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ আসে আবার চলিয়া যায়; দিন ও বৎসর আবর্তন করিয়া চলিয়াছে; জীবন আসে, আবার চলিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু নাই। 'আমি আছি, আমি আছি'—এই একই সুর চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা সব জানি। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা সব কিছু দেখি। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা সব কিছু অনুভব করি, চিন্তা করি, বাঁচিয়া থাকি; তাঁহারই মধ্যে ও তাঁহারই মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্ব। আর যে 'আমি'কে ভুল করিয়া আমরা ছোট 'আমি', সীমায়িত 'আমি' বলিয়া ভাবি, তাহা শুধু আমার 'আমি' নয়, তাহা তোমাদেরও 'আমি', প্রাণিগণের—দেবদূতগণেরও 'আমি', হীনতম জীবেরও 'আমি'। সেই 'আমি আছি' বোধ ঘাতকের মধ্যেও যেমন, সাধুর মধ্যেও ঠিক তেমনি; ধনীর মধ্যেও যা, দরিদ্রের মধ্যেও তাই; নর ও নারী, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী—সকলের মধ্যে এই বোধ এক। সর্বনিম্ন জীবকোষ হইতে সর্বোচ্চ দেবদূত পর্যন্ত প্রত্যেকের অন্তরেই তিনি বাস করিতেছেন এবং চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন, 'আমিই তিনি—সোঽহং, সোঽহম্।' অন্তরে চিরবিদ্যমান এই বাণী যখন আমাদের বোধগম্য হইবে, উহার শিক্ষা গ্রহণ করিব, তখন দেখিব—সমগ্র বিশ্বের রহস্য প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, দেখিব—প্রকৃতি আমাদের নিকট রহস্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। জানিবার আর কিছুই বাকী থাকিবে না। আমরা দেখিব, সমস্ত ধর্ম যে সত্যের সন্ধানে রত, যে সত্যের তুলনায় জড়বিজ্ঞানের সব জ্ঞানই গৌণ মাত্র, আমরা সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছি; ইহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান, যাহা আমাদিগকে বিশ্বের এই বিশ্বজনীন ঈশ্বরের সঙ্গে এক করিয়া দেয়।

৪. বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ

[কিভাবে ইহা বিভিন্ন প্রকার মানুষকে আকর্ষণ করিবে]

(ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা)

আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যে-কোন বস্তুকেই গ্রহণ করুন না কেন, অথবা আমাদের মন যে-কোন বিষয়ে কল্পনা করুক না কেন, সর্বত্রই আমরা দুইটি শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই; একটি অপরটির বিরুদ্ধে কার্য করিতেছে এবং আমাদের চতুর্দিকে জটিল ঘটনারাজি ও আমাদের অনুভূত মানসিক ভাবপরম্পরার অবিশ্রান্ত লীলাবিলাস সংঘটন করিতেছে। বহির্জগতে এই বিপরীত শক্তিদ্বয় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-রূপে অথবা কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তিরূপে, এবং অন্তর্জগতে রাগদ্বেষ ও শুভাশুভ-রূপে প্রকাশিত হইতেছে। কতকগুলি জিনিষের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ এবং কতকগুলির প্রতি আকর্ষণ আছে। আমরা কোনটির প্রতি আকৃষ্ট হই, আবার কোনটি হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমাদের জীবনে অনেকবার এমন হইয়া থাকে যে, কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ কোন কোন লোকের প্রতি যেন আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, আবার অন্য অনেক সময় যেন কোন কোন লোক দেখিলেই বিনা কারণে মন বিদ্বেষে পূর্ণ হয়। এই বিষয়টি সকলেরই কাছে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আর এই শক্তির কার্যক্ষেত্র যতই উচ্চতর হইবে, এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের প্রভাব ততই তীব্র ও স্পষ্ট হইতে থাকিবে। ধর্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর; এবং আমরা দেখিতে পাই, ধর্মজগতেই এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষ যত প্রকার প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, তন্মধ্যে তীব্রতম প্রেমলাভ হইয়াছে ধর্ম হইতে এবং মানুষ যত প্রকার পৈশাচিক ঘৃণার পরিচয় পাইয়াছে, তাহারও উদ্ভব হইয়াছে ধর্ম হইতে। জগৎ কোন কালে যে মহত্তম শান্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাহা ধর্মরাজ্যের লোকদেরই মুখনিঃসৃত, এবং জগৎ কোনকালে যে তীব্রতম নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাও ধর্মরাজ্যের লোকদের মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে। কোন ধর্মের উদ্দেশ্য যত উচ্চতর এবং উহার কার্যপ্রণালী যত সুবিন্যস্ত, তাহার ক্রিয়াশীলতা ততই

আশ্চর্য। ধর্মপ্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন প্রেরণায় তাহা ঘটে নাই; আবার ধর্মপ্রেরণায় যত চিকিৎসালয় ও আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কিছুতেই তত হয় নাই। ধর্মপ্রেরণার ন্যায় মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে শুধু মানবজাতির জন্য নয়, নিম্নতম প্রাণিগণের জন্য পর্যন্ত এতটা যত্ন লইতে প্রবৃত্ত করে নাই। ধর্মপ্রভাবে মানুষ যত নিষ্ঠুর হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, আবার ধর্মপ্রভাবে মানুষ যত কোমল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অতীতে এইরূপই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে। তথাপি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষ হইতে উত্থিত এই দ্বন্দ্ব-কোলাহল, এই বিবাদ-বিসংবাদ, এই হিংসাদ্বেষের মধ্য হইতেই সময়ে সময়ে এমন সব শক্তিশালী গম্ভীর কণ্ঠ উত্থিত হইয়াছে, যাহা এই সমুদয় কোলাহলকে ছাপাইয়া, যেন সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত সকলকে আপন বার্তা শুনিতে বাধ্য করিয়া সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও মিলনের বাণী ঘোষণা করিয়াছে। জগতে কি কখনও এই শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে?

ধর্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বিসংবাদের স্তরে একটি অবিচ্ছিন্ন সমন্বয় বিরাজিত থাকা কি কখনও সম্ভব? বর্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই মিলনের প্রশ্ন লইয়া জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমাজে এই সমস্যাপূরণের নানারূপ প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্যে পরিণত করিবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু ইহা যে কতদূর কঠিন, তাহা আমরা সকলেই জানি। জীবন-সংগ্রামের ভীষণতা লাঘব করা—মানুষের মধ্যে যে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা রহিয়াছে, তাহা মন্দীভূত করা—মানুষ এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে করে। জীবনের যাহা বাহ্য স্থূল এবং বহিরাংশমাত্র, সেই বহির্জগতের সাম্য ও শান্তি বিধান করাই যদি এত কঠিন হয়, তবে মানুষের অন্তর্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করা তদপেক্ষা সহস্রগুণ কঠিন। আমি আপনাদিগকে বাক্যজালের ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিতে অনুরোধ করি। আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক শব্দমাত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা সেগুলি তোতাপাখীর মত আওড়াইয়া থাকি এবং উহাই আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ঐরূপ না

করিয়া পারি না। যে-সকল মহাপুরুষ প্রথমে তাঁহাদের হৃদয়ে এই মহান্ তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই শব্দগুলি সৃষ্টি করেন। তখন অনেকেই এগুলির অর্থ বুঝিত। পরে অজ্ঞ লোকেরা এই শব্দগুলি লইয়া ছেলেখেলা করিতে থাকে, অবশেষে ধর্ম জিনিষটাকে কেবলমাত্র কথার মারপ্যাঁচে দাঁড় করান হইয়াছে—উহা যে জীবনে পরিণত করিবার জিনিষ, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা এখন 'পৈত্রিক ধর্ম', 'জাতীয় ধর্ম', 'দেশীয় ধর্ম' ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে। শেষে কোন ধর্মাবলম্বী হওয়াটা স্বদেশপ্রেমের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর স্বদেশপ্রেম সর্বদাই একদেশী। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার। তথাপি আমরা এই ধর্ম-সমন্বয়-সমস্যার আলোচনা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধর্মের তিনটি বিভাগ আছে—আমি অবশ্য প্রসিদ্ধ ও সর্বজনপরিচিত ধর্মগুলির কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ দার্শনিক ভাগ—যাহাতে সেই ধর্মের সমগ্র বিষয়বস্তু অর্থাৎ উহার মূলতত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও তাহা লাভের উপায় নিহিত। দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ভাগ অর্থাৎ দর্শনকে স্থূল রূপপ্রদান। উহাতে সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষদের জীবনের উপাখ্যানাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলি সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষদের অল্প-বিস্তর কাল্পনিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থূলভাবে বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ আনুষ্ঠানিক ভাগ—উহা ধর্মের আরও স্থূলভাগ—উহাতে পূজাপদ্ধতি, আচারানুষ্ঠান, বিবিধ অঙ্গন্যাস, পুষ্প, ধূপধুনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রয়োগ আছে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম এই-সকল লইয়া গঠিত। আপনারা দেখিতে পাইবেন, সমুদয় বিখ্যাত ধর্মের এই তিনটি ভাগ আছে। কোন ধর্ম হয়তো দার্শনিক ভাগের উপর বেশী জোর দেয়, কোন ধর্ম অপর কোনটির উপর। এক্ষণে প্রথম অর্থাৎ দার্শনিক ভাগের কথা ধরা যাক।

সর্বজনীন দর্শন বলিয়া কিছু আছে কি? এখন পর্যন্ত তো কিছু হয় নাই। প্রত্যেক ধর্মই তাহার নিজ নিজ মতবাদ উপস্থিত করিয়া সেইগুলিকে একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে জেদ করে। কেবলমাত্র ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। পরন্তু সেই- ধর্মাবলম্বী মনে

করে, যে ঐ মতে বিশ্বাস না করে, পরলোকে তাহার গতি ভয়াবহ হইবে। কেহ কেহ আবার অপরকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিবার জন্য তরবারি পর্যন্ত গ্রহণ করে। ইহা যে তাহারা দুর্মতিবশতঃ করিয়া থাকে, তাহা নয়—গোঁড়ামি-নামক মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাধিবিশেষের তাড়নায় করিয়া থাকে। এই গোঁড়ারা খুব অকপট—মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী অকপট, কিন্তু তাহারা জগতের অন্যান্য পাগলদেরই মত সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিরই মত এই গোঁড়ামিও একটি ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যত রকম কুপ্রবৃত্তি আছে, এই গোঁড়ামি তাহাদের সবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা-দ্বারা ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠে।

বিভিন্ন ধর্মের পুরাণগুলির ভিতরে কি কোন সাদৃশ্য আছে?—পৌরাণিক দৃষ্টিতে এমন কোন ঐক্য, এমন কোন ঐতিহ্যগত সার্বভৌমিকতা আছে কি, যাহা সকল ধর্মই গ্রহণ করিতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। সকল ধর্মেরই নিজ নিজ পুরাণ আছে—যদিও প্রত্যেকেই বলে, 'আমার পুরাণোক্ত গল্পগুলি কেবল উপকথা মাত্র নয়।' এই বিষয়টি উদাহরণ-সহায়ে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। আমি শুধু দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝাইতে চাহিতেছি। কোন ধর্মকে সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। খ্রীষ্টান বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর ঘুঘুর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ইহা ঐতিহাসিক সত্য—পৌরাণিক গল্পমাত্র নয়। হিন্দু আবার গাভীর মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব বিশ্বাস করেন। খ্রীষ্টান বলেন, এরূপ বিশ্বাসের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—উহা পৌরাণিক গল্পমাত্র, কুসংস্কার মাত্র। য়াহুদীগণ মনে করেন, যদি একটি বাক্সে বা সিন্দুকের দুই পার্শ্বে দুইটি দেবদূতের মূর্তি স্থাপন করা যায়, তবে উহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে পবিত্রতম স্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে—উহা যিহোবার দৃষ্টিতে পরম পবিত্র। কিন্তু মূর্তিটি যদি কোন সুন্দর নর বা নারীর আকারে গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারা বলে, 'উহা একটা বীভৎস পুতুল মাত্র, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলো!' পৌরাণিক দিক্ হইতে এই তো আমাদের মিল! যদি একজন লোক দাঁড়াইয়া বলে, 'আমাদের ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষেরা এই এই অত্যাশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন!' অপর সকলে বলিবে, ' ইহা কেবল কুসংস্কার মাত্র', আবার সঙ্গে সঙ্গে

তাহারা ইহাও বলিবে, তাহাদের নিজেদের ঈশদূতগণ ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্যজনক কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া দাবী করে। আমি যতদূর দেখিয়াছি, এই পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যিনি এই-সকল লোকের মাথার ভিতরে ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে এই যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রহিয়াছে, তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই প্রকার গল্পগুলি যে-ধর্মেরই হউক না কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরাণ-পর্যায়ভুক্ত, যদিও কখনও কখনও হয়তো ঐগুলির মধ্যে একটু-আধটু ঐতিহাসিক সত্য থাকিতে পারে।

তারপর অনুষ্ঠানগুলির কথা। সম্প্রদায়বিশেষের হয়তো কোন বিশেষ প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে এবং তাঁহারা উহাকেই পবিত্র এবং অপর সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলিকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। যদি এক সম্প্রদায় কোন বিশেষ প্রকার প্রতীকের উপাসনা করেন, তবে অপর সম্প্রদায় বলিয়া বসেন, 'ওঃ, কি জঘন্য!' একটি সাধারণ প্রতীকের কথা ধরা যাক। লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক নিশ্চয়ই পুংচিহ্ন বটে, কিন্তু ক্রমশঃ উহার ঐ দিকটা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বের প্রতীকরূপে গৃহীত হইতেছে। যে-সকল জাতি উহাকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা কখনও উহাকে পুংচিহ্নরূপে চিন্তা করে না, উহাও অন্যান্য প্রতীকের ন্যায় একটি প্রতীক—এই পর্যন্ত। কিন্তু অপর জাতি বা সম্প্রদায়ের একজন লোক উহাকে পুংচিহ্ন ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না, সুতরাং সে উহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করে। আবার সে হয়তো তখন এমন কিছু করিতেছে, যাহা তথাকথিত লিঙ্গোপাসকদের চক্ষে অতি বীভৎস ঠেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুইটিকে ধরা যাক—লিঙ্গোপাসনা ও স্যাক্রামেণ্ট (Sacrament)-নামক খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠান। খ্রীষ্টানগণের নিকট লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক অতি কুৎসিত এবং হিন্দুগণের নিকট খ্রীষ্টানদের স্যাক্রামেণ্ট বীভৎস বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন যে, কোন মানুষের সদগুণাবলী পাইবার আশায় তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা ও রক্তপান করা তো নরখাদকের বৃত্তি মাত্র। কোন কোন বর্বর জাতি এইরূপই করিয়া থাকে। যদি কোন লোক খুব বীর হয়, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করে; কারণ তাহারা মনে করে, ইহা-দ্বারা তাহারা সেই ব্যক্তির সাহস ও বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী লাভ

করিবে। স্যার জন লাবকের ন্যায় ভক্তিমান্ খ্রীষ্টানও এ-কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, বর্বরজাতিদের এই ধারণা হইতেই খ্রীষ্টান অনুষ্ঠানটির উদ্ভব। খ্রীষ্টানেরা অবশ্য উহার উদ্ভব সম্বন্ধে এই মত স্বীকার করেন না এবং ঐরূপ অনুষ্ঠান হইতে কিসের আভাস পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও তাঁহাদের মাথায় আসে না। উহা একটি পবিত্র ঘটনার প্রতীক–এইটুকু মাত্র জানিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ভাগেও এমন কোন সাধারণ প্রতীক নাই, যাহা সকল ধর্মমতেই সকলের পক্ষে স্বীকার্য ও গ্রহণীয় হইতে পারে। তাহা হইলে কিঞ্চিন্মাত্র সার্বভৌমিকত্ব আছে কোথায়?–তাহা হইলে ধর্মের কোন প্রকার সার্বভৌম রূপ গড়িয়া তোলা কিরূপে সম্ভব হইবে? বাস্তবিক কিন্তু তাহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এখন দেখা যাক–তাহা কি।

আমরা সকলেই সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা শুনতে পাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় উহার বিশেষ প্রচারে কিরূপ উৎসাহী, তাহাও দেখিয়া থাকি। আমার একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। ভারতবর্ষে মদ্যপান অতি মন্দকার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দুই ভাই ছিল, তাহারা এক রাত্রে লুকাইয়া মদ খাইবার ইচ্ছা করিল। পাশের ঘরেই তাহাদের খুল্লতাত নিদ্রা যাইতেছিল–তিনি একজন খুব নিষ্ঠাবান্ লোক ছিলেন। এই কারণে মদ্যপানের পূর্বে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল–'আমাদের খুব চুপিচুপি কাজ সারিতে হইবে, নতুবা খুল্লতাত জাগিয়া উঠিবেন।' তাহারা মদ খাইতে খাইতে পরস্পরকে চুপ করাইবার জন্য একের উপর স্বর চড়াইয়া অপরে চীৎকার করিতে লাগিল, 'চুপ চুপ, খুড়ো জাগবে।' গোলমাল বাড়ার ফলে খুল্লতাতের ঘুম ভাঙিয়া গেল–তিনি ঘরে ঢুকিয়া সমস্তই দেখিতে পাইলেন। আমরা ঠিক এই মাতালদের মত চীৎকার করি–'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব! আমরা সকলেই সমান; অতএব এস আমরা একটা দল করি।' কিন্তু যখনই তুমি দল গঠন করিলে, তখনই তুমি ফলতঃ সাম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে এবং তখনই আর সাম্য বলিয়া কোন কিছু রহিল না। মুসলমানগণ 'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভ্রাতৃভাব' করে, কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই, যে মুসলমান নয়, তাহাকে আর এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতর লওয়া হইবে না–তাহার গলা কাটা যাইবার সম্ভাবনাই অধিক।

খ্রীষ্টানগণ সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা বলে, কিন্তু যে খ্রীষ্টান নয়, তাহাকে এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যেখানে তাহার ভাগ্যে চির নরক-যন্ত্রণার ব্যবস্থা আছে।

এইরূপে আমরা 'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব' ও সাম্যের অনুসন্ধানে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যখন তুমি কোথাও এই-ভাবের কথা শুনিবে, তখনই আমার অনুরোধ, তুমি একটু ধীর ও সতর্ক হইবে, কারণ এই-সকল কথাবার্তার অন্তরালে প্রায়ই ঘোর স্বার্থপরতা লুকাইয়া থাকে। কথায় বলে, শরৎকালে কখনও কখনও আকাশে বজ্রনির্ঘোষকারী মেঘ দেখা যাইলেও গর্জন মাত্র শোনা যায়, কিন্তু একবিন্দুও বারিপাত হয় না, অপরপক্ষে বর্ষাকালে মেঘগুলি নীরব থাকিয়াই পৃথিবীকে প্লাবিত করে। সেইরূপ যাহারা প্রকৃত কর্মী এবং অন্তরে বাস্তবিক সকলের প্রতি প্রেম অনুভব করে, তাহারা মুখে লম্বা-চওড়া কথা বলে না, ভ্রাতৃভাব-প্রচারের জন্য দলগঠন করে না, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাহাদের গতিবিধি, তাহাদের সারাটা জীবন লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের অন্তর সত্যসত্যই মানবজাতির প্রতি প্রেমে পূর্ণ, তাহারা সকলকে ভালবাসে এবং সকলের ব্যথার ব্যথী, তাহারা কথা না কহিয়া কার্যে দেখায়—আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করে। সারা দুনিয়ায় লম্বা-চওড়া কথার মাত্রা বড়ই বেশী। আমরা চাই কথা কম এবং যথার্থ কাজ কিছু বেশী হউক।

এতক্ষণ আমরা দেখিলাম যে, ধর্মের সার্বভৌমিকতার বাস্তব রূপ বলিয়া কিছু খুঁজিয়া বাহির করা খুব কঠিন; তথাপি আমরা জানি, উহা আছে ঠিক। আমরা সকলেই মানুষ, কিন্তু আমরা সকলে কি সমান? কখনই নয়। কে বলে আমরা সমান? কেবল বাতুলেই এ-কথা বলিতে পারে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের শক্তি, আমাদের শরীর কি সব সমান? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা বলশালী, একজনের বুদ্ধিবৃত্তি অপরের চেয়ে বেশী। যদি আমরা সকলেই সমান হই, তবে এই অসামঞ্জস্য কেন? কে ইহা করিল? আমরা নিজেরা। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য, বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক বলের তারতম্য আছে বলিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য হইতে বাধ্য। তথাপি আমরা জানি, এই সাম্যবাদ আমাদের সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়া

থাকে। আমরা সকলেই মানুষ বটে—কিন্তু আমাদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ, কতকগুলি নারী; কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ শ্বেতকায়; কিন্তু সকলেই মানুষ—সকলেই এক মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মুখের চেহারা নানা রকমের। আমি দুইটি ঠিক এক রকমের মুখ দেখি নাই; তথাপি আমরা সকলে এক মানবজাতীয়। এই সাধারণ মনুষ্যত্বের স্বরূপটি কি? আমি কোন গৌরাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ নর বা নারীকে দেখিলাম; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিলাম যে, তাহাদের সকলের মুখে একটা ভাবময় সাধারণ মনুষ্যত্বের ছাপ আছে। যখন আমি উহাকে ধরিবার চেষ্টা করি, উহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে যাই, যখন বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন ইহা দেখিতে না পাইতে পারি, কিন্তু যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তবে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বরূপ এই সাধারণভাবই সেই বস্তু। নিজ মনোমধ্যে এই মানবত্বরূপ সাধারণ ভাবটি আছে বলিয়াই তদবলম্বনে আমি তোমাকে নর বা নারীরূপে জানিতে পারি। সর্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধেও এই কথা। ইহা ঈশ্বরের ধারণা অবলম্বনে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসমূহে অনুস্যূত রহিয়াছে। ইহা অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান আছে এবং নিশ্চিতই থাকিবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।' আমি মণিগণের ভিতর সূত্ররূপে বর্তমান রহিয়াছি—এই এক-একটি মণিকে এক-একটি ধর্মমত বা তদন্তর্গত সম্প্রদায়-বিশেষ বলা যাইতে পারে। পৃথক্ পৃথক্ মণিগুলি এইরূপ এক-একটি ধর্মমত এবং প্রভুই সূত্ররূপে সেই সকলের মধ্যে বর্তমান। তবে অধিকাংশ লোকই এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমরা সকলেই পরস্পর পৃথক্। মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক, কিন্তু যখন আমি অমুক, তখন আমি তোমা হইতে পৃথক্। পুরুষ হিসাবে তুমি নারী হইতে ভিন্ন, কিন্তু মানুষ হিসাবে নর ও নারী এক। মানুষ হিসাবে তুমি জীবজন্তু হইতে পৃথক্, কিন্তু প্রাণী হিসাবে স্ত্রী, পুরুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ সকলেই সমান; এবং সত্তা হিসাবে তুমি বিরাট বিশ্বের সহিত এক। সেই বিরাট সত্তাই ভগবান্—তিনি এই বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চের চরম একত্ব। তাঁহাতে আমরা সকলেই এক হইলেও ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্যে এই ভেদগুলি অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। বহির্দেশে আমাদের কার্যকলাপ বলবীর্য যেমন যেমন প্রকাশ পাইবে,

সেই সঙ্গে এই ভেদ সর্বদাই বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সর্বজনীন ধর্মের অর্থ যদি এই হয় যে, কতকগুলি বিশেষ মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করিবে, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কখনও হইতে পারে না—এমন সময় কখনও হইবে না, যখন সমস্ত লোকের মুখ এক রকম হইবে। আবার যদি আমরা আশা করি যে, সমস্ত জগৎ একই পৌরাণিক তত্ত্বে বিশ্বাসী হইবে, তাহা অসম্ভব; তাহাও কখনও হইতে পারে না। সমস্ত জগতে কখনও এক প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে না। এরূপ ব্যাপার কোন কালে কখনও হইতে পারে না; যদি কখনও হয়, তবে সৃষ্টি লোপ পাইবে, কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের মূল ভিত্তি। আকৃতিবিশিষ্ট জীবরূপে আমরা সৃষ্ট হইলাম কিরূপে? বৈচিত্র্য হইতে। সম্পূর্ণ সাম্যভাব হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমভাবে ও সম্পূর্ণরূপে তাপ বিকিরণ করাই উত্তাপের ধর্ম; এখন মনে করুন, এই ঘরের উত্তাপ-রাশী সেইভাবে বিকীর্ণ হইয়া গেল; তাহা হইলে কার্যতঃ সেখানে উত্তাপ বলিয়া পরে কিছু থাকিবে না। এই জগতে গতি সম্ভব হইতেছে কিসের জন্য? সমতাচ্যুতি ইহার কারণ। যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে, তখনই কেবল সাম্যরূপ ঐক্য আসিতে পারে; অন্যথা এরূপ হওয়া অসম্ভব। কেবল তাহাই নয়, এরূপ হওয়া বিপজ্জনক। আমরা সকলেই এক প্রকার চিন্তা করিব, এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নয়। তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিবে না। তখন যাদুঘরে অবস্থিত মিশরীয় মমিগুলির (mummies) মত আমরা সকলেই এক রকমের হইয়া যাইব, এবং পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিব—আমাদের মনে ভাবিবার মত কথাই উঠিবে না। এই পার্থক্য, এই বৈষম্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস, উহাই আমাদের যাবতীয় চিন্তার প্রসূতি। চিরকাল এইরূপই চলিবে।

সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ বলিতে তবে আমি কি বুঝি? আমি এমন কোন সার্বভৌম দার্শনিক তত্ত্ব, কোন সার্বভৌম পৌরাণিক তত্ত্ব, অথবা কোন সার্বভৌম আচার-পদ্ধতির কথা বলিতেছি না, যাহা সকলেই মানিয়া চলে। কারণ আমি জানি যে, নানা পাকে-চক্রে গঠিত, অতি জটিল ও অতি বিস্ময়াবহ এই জগৎ-রূপ দুর্বোধ্য ও বিশাল যন্ত্রটি বরাবর এইভাবেই চলিতে থাকিবে। আমরা তবে কি করিতে পারি?—আমরা ইহাকে সুচারুরূপে চলিতে

সাহায্য করিতে পারি, ইহার ঘর্ষণ কমাইতে পারি, ইহার চক্রগুলি তৈলসিক্ত ও মসৃণ রাখিতে পারি। কিরূপে?—বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া। আমাদিগকে আমাদের স্বভাববশতই যেমন একত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ বৈষম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য লক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক ভাবটিই তাহাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথার্থ। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, কোন বিষয়কে শত প্রকার বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখা চলে, অথচ বস্তুটি একই থাকে। সূর্যের কথা ধরা যাক। মনে করুন, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে সূর্যোদয় দেখিতেছে; সে প্রথমে একটি বৃহৎ গোলাকৃতি বস্তু দেখিতে পাইবে। তারপর মনে করুন, সে একটি ক্যামেরা লইয়া সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়া যে পর্যন্ত না সূর্যে পৌঁছায়, সেই পর্যন্ত পুনঃপুনঃ সূর্যের প্রতিচ্ছবি লইতে লাগিল। এক স্থল হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি স্থানান্তর হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি হইতে ভিন্ন হইবে। যখন সে ফিরিয়া আসিবে, তখন মনে হইবে, বাস্তবিক সে যেন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। আমরা কিন্তু জানি যে, সেই ব্যক্তি তাহার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থল হইতে একই সূর্যের বহু প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। ভগবান্ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, সূক্ষ্মতম অথবা স্থূলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়াই হউক, সুসংস্কৃত ক্রিয়াকাণ্ড অথবা জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়—প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক জাতি—প্রত্যেক ধর্ম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঊর্ধ্বগামী হইয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষ সত্যের যত প্রকার অনুভূতি লাভ করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটি ভগবানেরই দর্শন ছাড়া অপর কিছুই নয়। মনে করুন, আমরা সকলেই পাত্র লইয়া একটি জলাশয় হইতে জল আনিতে গেলাম। কাহারও হাতে বাটি, কাহারও কলসী, কাহারও বা বালতি ইত্যাদি এবং আমরা নিজ নিজ পাত্রগুলি ভরিয়া লইলাম। তখন বিভিন্ন পাত্রের জল স্বভাবতই আমাদের নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিবে। যে বাটি আনিয়াছে, তাহার জল বাটির মত; যে কলসী আনিয়াছে, তাহার জল কলসীর মত আকার ধারণ করিয়াছে; এমনি সকলের পক্ষে। কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই

কথা। আমাদের মনগুলি এই পাত্রের মত। আমরা প্রত্যেকেই ভগবান্ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যে জলদ্বারা পাত্রগুলি পূর্ণ রহিয়াছে, ভগবান্ সেই জলস্বরূপ এবং প্রত্যেক পাত্রের পক্ষে ভগবদ্দর্শন সেই সেই আকারে হইয়া থাকে। তথাপি তিনি সর্বত্রই এক। একই ভগবান্ ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। আমরা সার্বভৌম ভাবের এই একমাত্র বাস্তব পরিচয় পাইতে পারি।

এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল, মতবাদ হিসাবে তাহা বেশ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বাস্তব সামঞ্জস্য স্থাপনের কি কোন উপায় আছে? আমরা দেখিতে পাই, 'সকল ধর্মমতই সত্য'—এ-কথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে, আলেকজান্দ্রিয়ায়, ইওরোপে, চীনে, জাপানে, তিব্বতে এবং সর্বশেষে আমেরিকায় একটি সর্ববাদিসম্মত ধর্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্মকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সবগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ তাহারা কোন কার্যকর প্রণালী অবলম্বন করে নাই। পৃথিবীর সকল ধর্মই সত্য, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের একীকরণের এমন কোন কার্যকর উপায় তাঁহারা দেখাইয়া দেন নাই, যাহা দ্বারা এই সমন্বয়ের মধ্যেও সকল ধর্ম নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। সেই উপায়ই যথার্থ কার্যকর, যাহা ব্যক্তিগত ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু এ যাবৎ যে-সকল উপায়ে ধর্মজগতে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন ধর্মমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত হইলেও কার্যক্ষেত্রে কয়েকটি মতবিশেষের মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেইহেতু অপর কতকগুলি পরস্পর-বিবদমান ঈর্ষাপরায়ণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় রত নূতন দলেরই সৃষ্টি হইয়াছে।

আমারও নিজের একটি ক্ষুদ্র কার্য-প্রণালী আছে। জানি না—ইহা কার্যকর হইবে কিনা, কিন্তু আমি উহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। আমার কার্য-প্রণালী কি? মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই নীতিটি মানিয়া লইতে অনুরোধ করি—'কিছু নষ্ট করিও না', ধ্বংসবাদী সংস্কারকগণ জগতের কোন উপকারই

করিতে পারে না। কোন কিছু একেবারে ভাঙিও না, একেবারে ধূলিসাৎ করিও না, বরং গঠন কর। যদি পার সাহায্য কর; যদি না পার, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক, এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাও। যদি সাহায্য করিতে না পার, অনিষ্ট করিও না। যতক্ষণ মানুষ অকপট থাকে, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিও না। দ্বিতীয়তঃ যে যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর। যদি ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ, এবং আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ দিয়া সেই কেন্দ্রেরই দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রে পৌঁছিব এবং যে-কেন্দ্রে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌঁছিয়া আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু যে পর্যন্ত না সেখানে পৌঁছাই, সে পর্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে। এই-সকল ব্যাসার্ধই কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়। একজন তাহার স্বভাব অনুযায়ী একটি ব্যাসার্ধ দিয়া যাইতেছে, আর একজন অপর একটি ব্যাসার্ধ দিয়া যাইতেছে এবং আমরা সকলেই যদি নিজ নিজ ব্যাসার্ধ ধরিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে অবশ্য একই কেন্দ্রে পৌঁছিব; এইরূপ প্রবাদ আছে যে, 'সকল রাস্তাই রোমে পৌঁছায়।' প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। প্রত্যেকেই কালে চরম সত্য উপলব্ধি করিবে; কারণ শেষে দেখা যায়, মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষা বিধান করে। তুমি আমি কি করিতে পারি? তুমি কি মনে কর, তুমি একটি শিশুকেও কিছু শিখাইতে পার?—পার না। শিশু নিজেই শিক্ষালাভ করে। তোমার কর্তব্য, সুযোগ বিধান করা—বাধা দূর করা। একটা গাছ বাড়িতেছে। তুমি কি গাছটিকে বাড়াও? তোমার কর্তব্য গাছটির চারিদিকে বেড়া দেওয়া, যেন গরু-ছাগলে উহাকে না খাইয়া ফেলে; ব্যস্, ঐখানেই তোমার কর্তব্য শেষ। গাছ নিজেই বাড়ে। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। কেহই তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে না—কেহই তোমাকে আধ্যাত্মিক মানুষ করিয়া দিতে পারে না; তোমাকে নিজে নিজেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে; তোমার উন্নতি তোমার নিজের ভিতর হইতেই হইবে।

বাহিরের শিক্ষাদাতা কি করিতে পারেন? তিনি অন্তরায়গুলি কিঞ্চিৎ অপসারিত করিতে পারেন মাত্র। ঐখানেই তাঁহার কর্তব্য শেষ। অতএব যদি পার সহায়তা কর, কিন্তু বিনষ্ট

করিও না। তুমি কাহাকেও আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন করিতে পার—এ ধারণা একেবারে পরিত্যাগ কর। ইহা অসম্ভব। তোমার নিজের আত্মা ব্যতীত তোমার অপর কোন শিক্ষাদাতা নাই, ইহা স্বীকার কর। তাহাতে কি ফল হয়? সমাজে আমরা নানাবিধ স্বভাবের লোক দেখি। সংসারে সহস্র সহস্র প্রকার মন ও সংস্কার-বিশিষ্ট লোক রহিয়াছে, তাহাদিগের সম্পূর্ণ সামান্যীকরণ অসম্ভব; কিন্তু আপাততঃ আমাদের সুবিধামত তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ উদ্যমশীল কর্মঠ ব্যক্তি; তিনি কর্ম করিতে চান; তাঁহার পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীতে বিপুল শক্তি রহিয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য কাজ করা—হাসপাতাল নির্মাণ করা, সৎকার্য করা, রাস্তা প্রস্তুত করা, কার্যপ্রণালী স্থির করা ও প্রতিষ্ঠান গঠন করা। দ্বিতীয়তঃ ভাবুক লোক—যিনি শিব ও সুন্দরকে অত্যধিক ভালবাসেন। তিনি সৌন্দর্যের চিন্তা করিতে, প্রকৃতির মনোরম দিকটি উপভোগ করিতে এবং প্রেম ও প্রেমময় ভগবান্‌কে পূজা করিতে ভালবাসেন। তিনি পৃথিবীর সকল সময়ের যাবতীয় মহাপুরুষ, ধর্মাচার্য ও ভগবানের অবতারগণকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসেন; খ্রীষ্ট অথবা বুদ্ধ বাস্তবিকই ছিলেন, এ-কথা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় কি হয় না, তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না; খ্রীষ্টের প্রদত্ত 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) কবে প্রচারিত হইয়াছিল অথবা শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কোন্ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা তিনি বিশেষ আবশ্যক মনে করেন না; তাঁহার নিকট তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, তাঁহাদের মনোহর মূর্তিগুলি সমধিক আদরণীয়। ইহাই তাঁহার (আদর্শ প্রেমিকের) প্রকৃতি, ভাবুকের স্বভাবই এই প্রকার। তৃতীয়তঃ অতীন্দ্রিয়বাদী যোগী—তিনি নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে, মানব-মনের ক্রিয়াসমূহ জানিতে, অন্তরে কি কি শক্তি কার্য করিতেছে এবং কিরূপে তাহাদিগকে জানা যায়, পরিচালিত করা যায় ও বশীভূত করা যায়—এই-সকল বিষয় তিনি জানিতে চান। ইহাই ঐ যোগীর (mystic) মনের স্বভাব। চতুর্থতঃ দার্শনিক—যিনি প্রত্যেকটি বিষয় মাপিয়া দেখিতে চান এবং মানবীয় দর্শনের পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব, তাহারও ঊর্ধ্বে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে লইয়া যাইতে চান।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি কোন ধর্মকে সর্বাপেক্ষা বেশী লোকের উপযোগী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার বিভিন্ন লোকের মনের উপযোগী খাদ্য-যোগানোর ক্ষমতা থাকা

চাই; এবং যে ধর্মে এই ক্ষমতার অভাব, সেই ধর্মের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলি সবই একদেশী হইয়া পড়ে। মনে করুন, আপনি এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন, যাহারা ভক্তি ও ভাবুকতা প্রচার করে, গান করে, কাঁদে এবং প্রেম প্রচার করে; কিন্তু যখনই আপনি বলিলেন, 'বন্ধু, আপনি যাহা বলিতেছেন, সবই ঠিক, কিন্তু আমি চাই ইহা অপেক্ষাও শক্তিপ্রদ কিছু—আমি চাই একটু বুদ্ধিপ্রয়োগ, একটু দার্শনিকতা। আমি আরও বিচারপূর্বক বিষয়গুলি ধাপে ধাপে বুঝিতে চাই।' তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিবে, 'দূর হও' এবং শুধু যে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে তাহা নয়, পারে তো আপনাকে একেবারে ভবপারে পাঠাইয়া দিবে। ফলে এই হয় যে, সেই সম্প্রদায় কেবল ভাবপ্রবণ লোকদিগকেই সাহায্য করিতে পারে। তাহারা অপরকে সাহায্য তো করেই না, পরন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে, এবং এই ব্যাপারের সর্বাপেক্ষা নীতিবিগর্হিত দিকটা এই যে, সাহায্যের কথা দূরে থাকুক, অপরে যে অকপট হইতে পারে, ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে না। এদিকে আবার দার্শনিকদের সম্প্রদায় আছে। তাঁহারা ভারত ও প্রাচ্যের জ্ঞানের বড়াই করেন এবং মনস্তত্ত্ববিষয়ক খুব লম্বা-চওড়া গালভরা শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু যদি আমার মত একজন সাধারণ লোক তাঁহাদের নিকট গিয়া বলে, 'আমাকে ধার্মিক হওয়ার মত কিছু উপদেশ দিতে পারেন কি?' তাহা হইলে তাঁহারা প্রথমেই একটু মুচকি হাসিয়া বলিবেন, 'ওহে, তুমি বুদ্ধিবৃত্তিতে এখনও আমাদের বহু নীচে। তুমি আধ্যাত্মিকতার কি বুঝিবে?' ইঁহারা বহু উঁচুদরের দার্শনিক। তাঁহারা তোমাকে শুধু বাহিরে যাইবার দরজা দেখাইয়া দিতে পারেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা যোগমার্গী (mystic), তাঁহারা জীবের বিভিন্ন অবস্থা, মনের বিভিন্ন স্তর, মানসিক সিদ্ধির ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা তোমাকে বলিবেন এবং তুমি যদি সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাদিগকে বল, 'আমাকে এমন কোন সদুপদেশ দিন, যাহা কার্যে পরিণত করিতে পারি। আমি অত কল্পনাপ্রিয় নই। আমার উপযোগী কিছু দিতে পারেন কি?' তাঁহারা হাসিয়া বলিবেন, 'নির্বোধটা কি বলে শোন; কিছুই জানে না—আহাম্মকের জীবনই বৃথা।' পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ চলিতেছে। আমি এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের একটা ঘরে একত্র পুরিয়া তাহাদের সুন্দর বিদ্রূপব্যঞ্জক হাস্যের আলোকচিত্র তুলিতে চাই।

ইহাই ধর্মের সমসাময়িক অবস্থা, ইহাই বর্তমান পরিস্থিতি। আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মনের উপযোগী হইবে—ইহা সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে 'মরমী' এবং কর্মপ্রেরণাময় হইবে। যদি কলেজ হইতে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ আসেন, তাঁহারা যুক্তিবিচার পছন্দ করিবেন। তাঁহারা যত পারেন বিচার করুন। শেষে তাঁহারা এমন একস্থানে পৌঁছিবেন, যেখানে তাঁহাদের মনে হইবে যে, যুক্তিবিচারের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহারা বলিয়া বসিবেন, 'ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি ভাবগুলি কুসংস্কার মাত্র—উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।' আমি বলি, 'হে দার্শনিক প্রবর, তোমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যে আরও বড় কুসংস্কার, এটিকে পরিত্যাগ কর। আহার করিবার জন্য আর গৃহে বা অধ্যাপনার জন্য তোমার দর্শনবিজ্ঞানের ক্লাসে যাইও না। শরীর ছাড়িয়া দাও এবং যদি না পার, জীবনভিক্ষা চাহিয়া চুপ করিয়া বস।' কারণ যে-দর্শন আমাদিগকে জগতের একত্ব ও বিশ্বময় একই সত্তার অস্তিত্ব শিক্ষা দেয়, সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার উপায় দেখাইবার সামর্থ্য ধর্মের থাকা আবশ্যক। সেইরূপ যদি 'মরমী' যোগী কেহ আসেন, আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দিতে ও হাতে-কলমে তাহা করিয়া দেখাইতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। যদি ভক্ত লোক আসেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া ভগবানের নামে হাসিব ও কাঁদিব, আমরা 'প্রেমের পেয়ালা পান করিয়া মত্ত হইয়া যাইব।' যদি একজন উদ্যমশীল কর্মী আসেন, আমরা তাঁহার সহিত যথাসাধ্য কর্ম করিব। এই প্রকার সমন্বয়ই সার্বভৌম ধর্মের নিকটতম আদর্শ হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের প্রত্যেকটি ভাবই পূর্ণমাত্রায় অথচ সমভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে কি সুন্দরই না হইত! ইহাই আদর্শ, ইহাই আমার পূর্ণ মানবের আদর্শ। যাহাদের চরিত্রে এই ভাবগুলির একটি বা দুইটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত জগৎই সেইরূপ একদেশদর্শী মানুষে পরিপূর্ণ এবং তাহারা কেবল সেই রাস্তাটিই জানে, যাহাতে নিজেরা চলাফেরা করে; এতদ্ব্যতীত অপর যাহা কিছু সমস্তই তাহাদের নিকট বিপজ্জনক ও জঘন্য। এই চারিটি দিকে সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশলাভ করাই আমার প্রস্তাবিত ধর্মের

আদর্শ এবং ভারতবর্ষে আমরা যাহাকে 'যোগ' বলি, তাহা দ্বারাই এই আদর্শ ধর্ম লাভ করা যায়। কর্মীর দৃষ্টিতে ইহার অর্থ ব্যক্তির সহিত সমগ্র মানবজাতির অভেদ-ভাব; 'মরমী'র দৃষ্টিতে ইহার অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সাধন; ভক্তের নিকট ইহার অর্থ নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের মিলন এবং জ্ঞানীর নিকট ইহার অর্থ নিখিল সত্তার ঐক্য-বোধ। 'যোগ' শব্দে ইহাই বুঝায়। ইহা একটি সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃতে এই চারিপ্রকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যিনি এই প্রকার যোগসাধন করিতে চান, তিনিই 'যোগী'। যিনি কর্মের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'কর্মযোগী' বলে। যিনি প্রেমের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'ভক্তিযোগী' বলে। যিনি ধ্যানধারণার মধ্য দিয়া সাধন করেন, তাঁহাকে 'রাজযোগী' বলে। যিনি জ্ঞানবিচারের মধ্য দিয়া যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'জ্ঞানযোগী' বলে। অতএব 'যোগী' বলিতে ইঁহাদের সকলকেই বুঝায়।

এখন প্রথমে 'রাজযোগ'-এর কথা ধরি। এই রাজযোগ—এই মনঃসংযোগের ব্যাপারটা কি? ইংলণ্ডে আপনারা 'যোগ' কথাটির সহিত ভূত প্রেত প্রভৃতি নানারকমের কিম্ভূতকিমাকার ধারণা জড়াইয়া রাখিয়াছেন। অতএব প্রথমেই আপনাদিগকে ইহা বলিয়া রাখা আমার কর্তব্য বোধ হইতেছে যে, যোগের সহিত ইহাদের কোনই সংস্রব নাই। এইগুলির মধ্যে কোন যোগেই তোমাকে যুক্তিবিচার পরিত্যাগ করিতে, অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতে অথবা পুরোহিতকুল যে-কোন পর্যায়েরই হউন না কেন, তাঁহাদের হাতে তোমার বিচারশক্তি সমর্পণ করিতে বলে না। কোন যোগই বলে না যে, তোমাকে কোন অতিমানুষ ঈশদূতের নিকট সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেকেই বলে, তুমি তোমার বিচারশক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধর, তাহাতেই লাগিয়া থাক। আমরা সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানলাভের তিন প্রকার উপায় দেখিতে পাই। প্রথম সহজাত জ্ঞান, যাহা জীবজন্তুর মধ্যেই বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা জ্ঞানলাভের সর্বনিম্ন উপায়। দ্বিতীয় উপায় কি? বিচারশক্তি। মানুষের মধ্যেই ইহার সমধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সহজাত জ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ উপায়। জীবজন্তু সকলের কার্যক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ এবং এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই সহজাত জ্ঞান কার্য করে। মানুষের বেলায় দেখা যায়,

এই সহজাত জ্ঞান বহুলভাবে বিচারশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কার্যক্ষেত্রও বাড়িয়া গিয়াছে। তথাপি এই বিচার-শক্তিরও যথেষ্ট অপ্রাচুর্য রহিয়াছে। বিচারশক্তি কিছুদূর পর্যন্তই মাত্র অগ্রসর হইতে পারে, তারপর সে থামিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না; এবং যদি তুমি ইহাকে বেশী দূর চালাইতে চেষ্টা কর, তবে তাহার ফলে এক দুরপনেয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, যুক্তি নিজেই অযুক্তিতে পরিণত হয়। যুক্তি তখন চক্রাকারে চলিতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের প্রত্যক্ষের মূলীভূত কারণ জড় ও শক্তির কথাই ধরুন। জড় কি?—যাহার উপর শক্তি ক্রিয়া করে। শক্তি কি?—যাহা জড়ের উপর ক্রিয়া করে। এই-সব কথায় গোলমালটা কোথায়, তাহা আপনারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন। ন্যায়শাস্ত্রবিদগণ ইহাকে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ বলেন—একটির (অর্থাৎ জড়ের) ধারণার জন্য অপরটির (অর্থাৎ শক্তির) উপর নির্ভর করিতে হইতেছে; আবার অপরটির (শক্তির) ধারণার জন্য প্রথমটির (জড়ের) উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। সুতরাং আপনারা যুক্তির সম্মুখে এক প্রবল বাধা দেখিতে পাইতেছেন, যাহাকে অতিক্রম করিয়া যুক্তি আর অগ্রসর হইতে পারে না। তথাপি এই বাধার অপর প্রান্তে যে অনন্তের রাজ্য রহিয়াছে, সেখানে পৌঁছাইতে যুক্তি সর্বদা ব্যস্ত। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনের বিষয়ীভূত এই জগৎ, এই নিখিল বিশ্ব আমাদের বুদ্ধিভূমির উপর প্রতিফলিত, সেই অনন্তের এক কণিকামাত্র; বুদ্ধিরূপ জাল দ্বারা বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আমাদের বিচারশক্তি কার্য করে—তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। সুতরাং ইহার বাহিরে যাইবার জন্য আমাদের অপর কোন উপায়ের প্রয়োজন—প্রজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয়-বোধ। অতএব সহজাত জ্ঞান, বিচারশক্তি ও অতীন্দ্রিয়-বোধ—এই তিনটিই জ্ঞানলাভের উপায়। পশুতে সহজাত জ্ঞান, মানুষে বিচারশক্তি ও দেবমানবে অতীন্দ্রিয়-বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল মানুষের ভিতরেই এই তিনটি শক্তির বীজ অল্পবিস্তর পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই-সকল মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে হইলে উহাদের বীজগুলিও অবশ্যই মানব-মনে থাকা চাই, এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, একটি শক্তি অপরটির বিকশিত অবস্থা মাত্র; সুতরাং তাহারা পরস্পর-বিরোধী নয়। বিচারশক্তিই পরিস্ফুট হইয়া অতীন্দ্রিয়-বোধে পরিণত হয়; সুতরাং অতীন্দ্রিয়-বোধ বিচারশক্তির পরিপন্থী নয়, পরন্তু

তাহার পরিপূরক। যে-সকল স্থলে বিচারশক্তি পৌঁছিতে পারে না, অতীন্দ্রিয়-বোধ তাহাদিগকেও উদ্ভাসিত করে, এবং তাহারা বুদ্ধির বিরোধী হয় না। বার্ধক্য বালকত্বের বিরোধী নয়, পরন্তু তাহার পরিণতি। অতএব তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, নিম্নশ্রেণীর জ্ঞানোপায়কে উচ্চশ্রেণীর উপায় বলিয়া ভুলকরা-রূপ ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অনেক সময়ে সহজাত জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয়-বোধ বলিয়া জগতে চালাইয়া দেওয়া হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বক্তা সাজিবার সকল প্রকার মিথ্যা দাবী আসিয়া পড়ে। একজন নির্বোধ অথবা অর্ধোন্মাদ ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার মস্তিষ্কে যে- সকল পাগলামি চলিতেছে, সেগুলিও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং সে চায় লোকে তাহাকে অনুসরণ করুক। জগতে সর্বাপেক্ষা পরস্পর-বিরোধী যত প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বিকৃতমস্তিষ্ক কতগুলি উন্মাদের সহজাত জ্ঞানানুযায়ী প্রলাপবাক্যকে অতীন্দ্রিয়-বোধের ভাষা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃত উপদেশের প্রথম লক্ষণ এই হওয়া চাই যে, ইহা কখনও যুক্তিবিরোধী হইবে না; এবং আপনারা দেখিতে পাইবেন, উল্লিখিত সকল যোগ এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে রাজযোগের কথা ধরা যাক। রাজযোগ মনস্তত্ত্ববিষয়ক যোগ, মনোবৃত্তির সহায়-অবলম্বনে পরমাত্মযোগে পৌঁছিবার উপায়। বিষয়টি খুব বড়; তাই আমি এক্ষণে এই 'যোগ'-এর মূল ভাবটিই আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। জ্ঞানলাভ করিবার আমাদের একটি মাত্র উপায় আছে। নিম্নতম মনুষ্য হইতে সর্বোচ্চ 'যোগী' পর্যন্ত সকলকেই সেই এক উপায় অবলম্বন করিতে হয়—একাগ্রতাই এই উপায়। রসায়নবিদ্ যখন তাঁহার পরীক্ষাগারে (Laboratory) কাজ করেন, তখন তিনি তাঁহার মনের সমস্ত শক্তি সংহত করেন, উহাকে এককেন্দ্রিক করেন, এবং সেই শক্তিকে পদার্থবিশেষের উপর প্রয়োগ করেন। তখন ঐ পদার্থের সংগঠক ভূতবর্গ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং এইরূপে তিনি তাহাদের জ্ঞানলাভ করেন। জ্যোতির্বিদও তাঁহার সমুদয় মনঃশক্তিকে সংহত করিয়া তাহাকে এককেন্দ্রিক করেন; তারপর তাঁহার দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়া ঐ শক্তিকে বস্তুর উপর প্রয়োগ করেন; তখন নক্ষত্রনিচয় ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল ঘুরিয়া তাহার দিকে আসে এবং

নিজ নিজ রহস্য তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত করে। অধ্যাপনারত আচার্যই বল, অথবা পাঠনিরত ছাত্রই বল, যেখানে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সকলের পক্ষে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, উহা যদি আপনাদের ভাল লাগে, তবে আপনাদের মন উহার প্রতি একাগ্র হইবে; তখন যদি একটা ঘড়ি বাজে, আপনারা তাহা শুনিতে পাইবেন না, কারণ আপনাদের মন তখন অন্য বিষয়ে একাগ্র হইয়াছে। আপনাদের মনকে যতই একাগ্র করিতে সক্ষম হইবেন, ততই আপনারা আমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন, এবং আমিও আমার প্রেম ও শক্তিসমূহকে যতই একাগ্র করিব, ততই আমার বক্তব্য বিষয়টি আপনাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সক্ষম হইব। এই একাগ্রতা যত অধিক হইবে, মানুষ তত অধিক জ্ঞানলাভ করিবে, কারণ ইহাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। এমন কি, অতি নীচ মুচিও যদি একটু বেশী মনঃসংযোগ করে তাহা হইলে সে তাহার জুতাগুলি আরও ভাল করিয়া বুরুশ করিবে; পাচক একাগ্র হইলে তাহার খাদ্য আরও ভাল করিয়া রন্ধন করিবে। অর্থোপার্জনই হউক অথবা ভগবদারাধনাই হউক—যে-কাজে মনের একাগ্রতা যত অধিক হইবে, কাজটি ততই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। কেবল এইভাবে ডাকিলে বা এইভাবে করাঘাত করিলেই প্রকৃতির ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং জগৎ আলোক-বন্যায় প্লাবিত হয়। ইহাই—এই একাগ্রতাশক্তিই জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের একমাত্র উপায়। রাজযোগে প্রায় এই বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আমরা এতই বিক্ষুব্ধ রহিয়াছি যে, আমাদের মন শত বিষয়ে তাহার শক্তি বৃথা ক্ষয় করিতেছে। যখনই আমি বাজে চিন্তা বন্ধ করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য কোন বিষয়ে মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করি, তখনই শতসহস্র অবাঞ্ছিত আলোড়ন মস্তিষ্কে দ্রুত উত্থিত হইয়া, শতসহস্র চিন্তা যুগপৎ মনে উদিত হইয়া উহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কিরূপে ঐগুলি নিবারণ করিয়া মন বশে আনিতে পারা যায়, তাহাই রাজযোগের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

এক্ষণে কর্মযোগের অর্থাৎ কর্মের মধ্য দিয়া ভগবান্-লাভের কথা ধরা যাক। সংসারে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কোন-না-কোন প্রকার কাজ করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের মন শুধু চিন্তার রাজ্যেই একাগ্র হইয়া থাকিতে পারে

না—তাহারা বোঝে কেবল কাজ—যা চোখে দেখা যায় এবং হাতে করা যায়। এই প্রকার লোকের জন্যও একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন কর্ম করিতেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অধিকাংশ শক্তির অপব্যবহার করিয়া থাকে; কারণ আমরা কর্মের রহস্য জানি না। কর্মযোগ এই রহস্যটি বুঝাইয়া দেয় এবং কোথায় কিভাবে কার্য করিতে হইবে, উপস্থিত কর্মে কিভাবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ হইবে, তাহা শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই রহস্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্মের বিরুদ্ধে 'উহা দুঃখজনক' এই বলিয়া যে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হয়, আমাদিগকে তাহারও বিচার করিতে হইবে। সমুদয় দুঃখ-কষ্ট আসক্তি হইতে আসে। আমি কাজ করিতে চাই—আমি কোন লোকের উপকার করিতে চাই; এবং শতকরা নব্বইটি স্থলেই দেখা যায় যে, আমি যাহাকে সাহায্য করিয়াছি, সেই ব্যক্তি সমস্ত উপকার ভুলিয়া আমার শত্রুতা করে; ফলে আমাকে কষ্ট পাইতে হয়। এবংবিধ ঘটনার ফলেই মানুষ কর্ম হইতে বিরত হয় এবং এই দুঃখ-কষ্টের ভয়ই মানবের কর্ম ও উদ্যমের অনেকটা নষ্ট করিয়া দেয়। কাহাকে সাহায্য করা হইতেছে, এবং কোন্ প্রয়োজনে সাহায্য করা হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া অনাসক্তভাবে শুধু কর্তব্যবোধে কর্ম করিতে হয়, কর্মযোগ তাহাই শিক্ষা দেয়। কর্মযোগী কর্ম করেন, কারণ উহা তাঁহার স্বভাব, তিনি প্রাণে প্রাণে বোধ করেন এরূপ করা তাঁহার পক্ষে কল্যাণজনক—ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তিনি জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করেন, কখনও কিছু প্রত্যাশা করেন না। তিনি জ্ঞাতসারে দান করিয়াই যান, কিন্তু প্রতিদানস্বরূপ কিছুই চান না। সুতরাং তিনি দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পান। যখনই দুঃখ আমাদিগকে গ্রাস করে, তখনই বুঝিতে হইবে, উহা 'আসক্তি'র প্রতিক্রিয়া মাত্র।

অতঃপর ভাবপ্রবণ বা প্রেমিক লোকদিগের জন্য ভক্তিযোগ। ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসিতে চান, তিনি ধর্মের অঙ্গরূপে ক্রিয়াকলাপের এবং পুষ্প, গন্ধ, সুরম্য মন্দির, মূর্তি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের উপর নির্ভর করেন এবং সাধনায় তাহাদের প্রয়োগ করেন। আপনারা কি বলিতে চান, তাঁহারা ভুল করেন? আমি আপনাদিগকে একটি সত্য কথা বলিতে চাই, তাহা আপনাদের—বিশেষতঃ এই দেশে—মনে রাখা ভাল। যে-সকল ধর্ম-সম্প্রদায়

অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক তত্ত্বসম্পদে সমৃদ্ধ, তাহাদের মধ্য হইতেই জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যে-সকল সম্প্রদায় কোন প্রতীক বা অনুষ্ঠানবিশেষের সহায়তা ব্যতীত ভগবান্ লাভের চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা ধর্মের যাহা কিছু সুন্দর ও মহান্ সমস্ত নির্মমভাবে পদদলিত করিয়াছে। খুব ভাল চক্ষে দেখিলেও তাহাদের ধর্ম গোঁড়ামি মাত্র, এবং শুষ্ক। জগতের ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং এই-সকল অনুষ্ঠান ও পুরাণাদিকে গালি দিও না। যে-সকল লোক ঐগুলি লইয়া থাকিতে চায়, তাহারা ঐগুলি লইয়া থাকুক। তোমরা অযথা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিও না, 'তাহারা মূর্খ, উহা লইয়াই থাকুক।' তাহা কখনই নয়; আমি জীবনে যে-সকল আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই এই-সকল অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। আমি নিজেকে তাঁহাদের পদতলে বসিবার যোগ্য মনে করি না, আবার আমি কিনা তাঁহাদের সমালোচনা করিতে যাইব! এই সমুদয় ভাব মানব-মনে কিরূপ কার্য করে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি আমার গ্রাহ্য, কোন্‌টি ত্যাজ্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব? আমরা উচিত অনুচিত বিচার না করিয়াই পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের সমালোচনা করিয়া থাকি। লোকে এই-সকল সুন্দর সুন্দর উদ্দীপনাপূর্ণ পুরাণাদি যত ইচ্ছা গ্রহণ করুক; কারণ আপনাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রবণ লোকেরা সত্যের কতকগুলি নীরস সংজ্ঞা মাত্র লইয়া থাকিতে মোটেই পছন্দ করেন না। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট 'ধরা ছোঁয়ার' বস্তু, তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। তাঁহারা ভগবান্‌কে অনুভব করেন, তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহাকে দেখেন, ভালবাসেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভগবান্ লাভ করুন। তোমরা যুক্তিবাদীরা, ভক্তের চক্ষে তেমনি নির্বোধ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি সুন্দর মূর্তি দেখিলে তাহাকে চূর্ণ করিয়া বুঝিতে চায় উহা কি পদার্থে নির্মিত। 'ভক্তিযোগ' তাহাদিগকে কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছাড়িয়া ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়; লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা কিংবা অন্য কোন কামনার জন্য নয়, কিন্তু মঙ্গলময়কে মঙ্গলময়রূপে, এবং ভগবান্‌কে ভগবান্‌রূপে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। প্রেমই প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান এবং ভগবান্‌ই প্রেমস্বরূপ—ইহাই ভক্তিযোগের শিক্ষা। ভক্তিযোগ তাঁহাদিগকে ভগবান্, সৃষ্টিকর্তা, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্, শাস্তা এবং

পিতা ও মাতা বলিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে শিক্ষা দেয়। মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে অথবা মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে যে সর্বোচ্চ ধারণা করিতে পারে, তাহা এই যে, তিনি প্রেমের ঈশ্বর। 'যেখানেই কোন প্রকার ভালবাসা রহিয়াছে, তাহাই তিনি।' যেখানে এতটুকু প্রেম, তাহা তিনিই; ঈশ্বর সেখানে বিরাজমান। স্বামী যখন স্ত্রীকে চুম্বন করেন, সে চুম্বনে তিনিই বিদ্যমান; মাতা যখন শিশুকে চুম্বন করেন, সেখানেও তিনি বিদ্যমান; বন্ধুগণের করমর্দনে সেই প্রভুই প্রেমময় ভগবান্‌রূপে বিদ্যমান। যখন কোন মহাপুরুষ মানবজাতিকে ভালবাসিয়া তাহাদের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রভুই তাঁহার প্রেমভাণ্ডার হইতে মুক্তহস্তে ভালবাসা বিতরণ করিতেছেন। যেখানেই হৃদয়ের বিকাশ হয়, সেখানেই তাঁহার প্রকাশ। 'ভক্তিযোগ' এই-সকল কথাই শিক্ষা দেয়।

সর্বশেষে আমরা 'জ্ঞানযোগী'র কথা আলোচনা করিব; তিনি দার্শনিক ও চিন্তাশীল, তিনি এই দৃশ্য-জগতের পারে যাইতে চান। তিনি এই সংসারের তুচ্ছ জিনিষ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নন। তিনি আমাদের পানাহারাদি প্রাত্যহিক কার্যাবলীর পারে যাইতে চান; সহস্র সহস্র পুস্তকও তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে না; এমন কি সমুদয় জড়বিজ্ঞানও তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, কারণ ইহা বড়জোর এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটি তাঁহার জ্ঞানগোচর করিতে পারে। এমন আর কি আছে, যাহা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে পারে? কোটি কোটি সৌরজগৎ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; তাঁহার চক্ষে তাহারা অস্তিত্বের সমুদ্রে বিন্দুমাত্র। তাঁহার আত্মা এই-সকলের পারে যাইয়া সকল অস্তিত্বের যাহা সার, সেই সত্যকে স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া, সেই বিরাট সত্তার সহিত অভিন্ন হইয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যাইতে চায়। ইহাই হইল জ্ঞানীর ভাব। তাঁহার মতে ভগবান্‌কে জগতের পিতা, মাতা, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পথপ্রদর্শক ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করা মোটেই সম্ভব নয়। তিনি ভাবেন, ভগবান্ তাঁহার প্রাণের প্রাণ, তাঁহার আত্মার আত্মা, ভগবান্ তাঁহার নিজেরই আত্মা। ভগবান্ ছাড়া আর কোন বস্তুই নাই। তাঁহার যাবতীয় নশ্বর অংশ বিচারের প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যায়, অবশেষে যাহা সত্যসত্যই থাকে, তাহাই পরমাত্মা স্বয়ং।

‘দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥’ ৭

গাছে দুইটি পাখী রহিয়াছে—একটি উপরে, একটি নীচে। উপরের পাখীটি স্থির, নির্বাক্, মহান্, নিজের মহিমায় নিজে বিভোর; নীচের ডালের পাখীটি কখনও সুমিষ্ট, কখনও তিক্ত ফল খাইতেছে, এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া উঠিতেছে এবং পর্যায়ক্রমে নিজেকে সুখী ও দুঃখী বোধ করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নীচের পাখীটি একটি অতি মাত্রায় তিক্ত ফল খাইল এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়া উপরের দিকে তাকাইল এবং অপর পাখীটিকে দেখিতে পাইল—সেই অপূর্ব সোনালী রঙের পাখাওয়ালা পাখীটি—সে মিষ্ট বা তিক্ত কোন ফলই খায় না এবং নিজেকে সুখী বা দুঃখীও মনে করে না, পরন্তু প্রশান্তভাবে আপনাতে আপনি থাকে—নিজের আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। নীচের পাখীটি ঐরূপ অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু শীঘ্রই ইহা ভুলিয়া গিয়া আবার ফল খাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল পরে সে আবার একটা অতি তিক্ত ফল খাইল। তাহাতে তাহার মনে অতিশয় দুঃখ হইল এবং সে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল এবং উপরের পাখীটির কাছে যাইবার চেষ্টা করিল। আবার সে এ-কথা ভুলিয়া গেল এবং কিছুকাল পরে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল। বারবার এইরূপ করিতে করিতে সে অবশেষে সুন্দর পাখীটির খুব নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং দেখিল অপর পক্ষীর পক্ষ হইতে জ্যোতির ছটা আসিয়া তাহার নিজ দেহের চতুর্দিকে পড়িয়াছে। সে এক পরিবর্তন অনুভব করিল—যেন সে মিলাইয়া যাইতেছে; সে আরও নিকটে আসিল, দেখিল তাহার চারিদিকে যাহা কিছু ছিল সমস্তই অদৃশ্য—অন্তর্হিত হইতেছে। অবশেষে সে এই অদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থ বুঝিল। নীচের পাখীটি যেন উপরের পাখীটির স্থূলরূপে প্রতীয়মান ছায়া

মাত্র—প্রতিবিম্ব মাত্র ছিল। সে নিজে বরাবর স্বরূপতঃ সেই উপরের পাখীই ছিল। নীচের ছোট পাখীটির এই মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাওয়া এবং পর পর সুখ-দুঃখ বোধ করা—এই সবই মিথ্যা—স্বপ্ন মাত্র; সেই প্রশান্ত, নির্বাক্, মহিমময়, শোকদুঃখাতীত উপরের পাখীটিই সর্বক্ষণ বিদ্যমান ছিল। উপরের পাখীটি ঈশ্বর, পরমাত্মা—জগতের প্রভু; এবং নীচের পাখীটি জীবাত্মা—এই জগতের সুখ-দুঃখরূপ বিষ ও তিক্ত ফলসমূহের ভোক্তা। মধ্যে মধ্যে জীবাত্মার উপর প্রবল আঘাত আসে; সে কিছুক্ষণের জন্য ফলভোগ বন্ধ করিয়া সেই অজ্ঞাত ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাহার হৃদয়ে সহসা জ্ঞানজ্যোতির প্রকাশ হয়। সে তখন মনে করে, এই জগৎ মিথ্যা দৃশ্যজাল মাত্র। কিন্তু পুনরায় ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বহির্জগতে টানিয়া নামাইয়া আনে এবং সেও পূর্বের ন্যায় এই জগতের ভালমন্দ ফল ভোগ করিতে থাকে। আবার সে এক অতি কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং আবার তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হইয়া দিব্য জ্ঞানালোক প্রবেশ করে। এইরূপ ধীরে ধীরে সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় এবং যতই সে নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই দেখিতে পায়, তাহার 'কাঁচা আমি' স্বতই লীন হইয়া যাইতেছে। যখন সে খুব নিকটে আসিয়া পড়ে, তখন দেখিতে পায়, সে নিজেই পরমাত্মা এবং বলিয়া উঠে, 'যাঁহাকে আমি তোমাদিগের নিকট জগতের জীবন এবং অণুপরমাণুতে ও চন্দ্র-সূর্যে বিদ্যমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তিনি আমাদের এই জীবনের অবলম্বন—আমাদের আত্মার আত্মা। শুধু তাহাই নয়, তুমিই সেই—তত্ত্বমসি।' 'জ্ঞানযোগ' আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয়। ইহা মানুষকে বলে, তুমি স্বরূপতঃ পরমাত্মা। ইহা মানুষকে প্রাণিজগতের মধ্যে যথার্থ একত্ব দেখাইয়া দেয়—আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়া স্বয়ং প্রভুই এই জগতে প্রকাশ পাইতেছেন। অতি সামান্য পদদলিত কীট হইতে যাঁহাদিগকে আমরা সবিস্ময়ে হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করি, সেই-সব শ্রেষ্ঠ জীব পর্যন্ত সকলেই সেই এক পরমাত্মার প্রকাশ মাত্র।

শেষ কথা এই যে, এই-সকল বিভিন্ন যোগ আমাদিগকে কার্যে পরিণত করিতেই হইবে; কেবল তাহাদের সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করিলে চলিবে না। 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—প্রথমে এগুলি সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, পরে শ্রুত বিষয়গুলি চিন্তা করিতে হইবে। আমাদিগকে সেগুলি বেশ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে—যেন আমাদের মনে

তাহাদের একটা ছাপ পড়ে। অতঃপর তাহাদিগকে ধ্যান এবং উপলব্ধি করিতে হইবে–যে পর্যন্ত না আমাদের সমস্ত জীবনটাই তদ্ভাবভাবিত হইয়া উঠে। তখন ধর্ম জিনিষটা আর শুধু কতকগুলি ধারণা বা মতবাদের সমষ্টি অথবা বুদ্ধির সায় মাত্র হইয়া থাকিবে না। তখন ইহা আমাদের জীবনের সহিত এক হইয়া যাইবে। বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা অনেক মূর্খতাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কালই হয়তো আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করিতে পারি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম কখনই পরিবর্তিত হয় না। ধর্ম অনুভূতির বস্তু–উহা মুখের কথা বা মতবাদ বা যুক্তিমূলক কল্পনা মাত্র নয়–তাহা যতই সুন্দর হউক না কেন। ধর্ম–জীবনে পরিণত করিবার বস্তু, শুনিবার বা মানিয়া লইবার জিনিষ নয়; সমস্ত মনপ্রাণ বিশ্বাসের বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইবে। ইহাই ধর্ম।

৫. বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায়

[১৯০০ খ্রীঃ ২৮ জানুআরী ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনাস্থিত ইউনিভার্সালিষ্ট চার্চে প্রদত্ত]

যে-অনুসন্ধানের ফলে আমরা ভগবানের নিকট হইতে আলো পাই, মনুষ্য-হৃদয়ের নিকট তদপেক্ষা প্রিয়তর অনুসন্ধান আর নাই। কি অতীত কালে, কি বর্তমান কালে 'আত্মা' 'ঈশ্বর' ও 'অদৃষ্ট' সম্বন্ধে আলোচনায় মানুষ যত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে, অন্য কোন আলোচনায় তত করে নাই। আমরা আমাদের দৈনিক কাজ-কর্ম, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের কর্তব্য প্রভৃতি লইয়া যতই ডুবিয়া থাকি না কেন, আমাদের সর্বাপেক্ষা কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যেও কখনও কখনও এমন একটি বিরাম-মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন মন সহসা থামিয়া যায় এবং এই জগৎপ্রপঞ্চের পারে কি আছে, তাহা জানিতে চায়। কখনও কখনও সে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কিছু কিছু আভাস পায় এবং ফলে তাহা পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে। সর্বকালে সর্বদেশে এইরূপ ঘটিয়াছে। মানুষ অতীন্দ্রিয় বস্তুর দর্শন লাভ করিতে চাহিয়াছে, নিজেকে বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, এবং যাহা কিছু আমাদের নিকট উন্নতি বা ক্রমাভিব্যক্তি নামে পরিচিত, তাহা সর্বকালে মানবজীবনের চরম গতি—ঈশ্বরানুসন্ধানের তুলাদণ্ডে পরিমিত হইয়াছে।

আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রাম যেমন বিভিন্ন জাতির বিবিধ প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি মানবের আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রামও বিভিন্ন ধর্ম-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেরূপ সর্বদাই পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ এই ধর্মসম্প্রদায়গুলিও সর্বদা পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রামে রত। কোন এক বিশেষ সমাজ-সংস্থার অন্তর্ভুক্ত লোকেরা দাবী করে যে, একমাত্র তাহাদেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এবং তাহারা যতক্ষণ পারে দুর্বলের উপর অত্যাচার করিয়া সেই অধিকার বজায় রাখিতে চায়। আমরা জানি, এইরূপ একটি ভীষণ সংগ্রাম বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিতেছে। সেইরূপ

প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ও এই প্রকার দাবী করিয়া আসিয়াছে যে, শুধু তাহারই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, যদিও ধর্ম মানবজীবনে যতটা মঙ্গলবিধান করিয়াছে, অপর কিছুই তাহা পারে নাই, তথাপি ধর্ম আবার যেরূপ বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে, আর কিছুই এমন করে নাই। ধর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক শান্তি ও প্রেম বিস্তার করিয়াছে, আবার ধর্মই সর্বাপেক্ষা ভীষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্মই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আবার ধর্মই মানুষে মানুষে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক শত্রুতা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্মই মানুষের—এমন কি পশুর জন্য পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে, আবার ধর্মই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে। আবার আমরা ইহাও জানি যে, সব সময়েই ফল্গুধারার ন্যায় আর একটা চিন্তাস্রোতও চলিয়াছে; সব সময়েই বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় রত এমন অনেক তত্ত্বান্বেষী বা দার্শনিক রহিয়াছেন, যাঁহারা এই সকল পরস্পর-বিবদমান ও বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর শান্তি স্থাপন করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কোন কোন দেশে এই চেষ্টা সফল হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর দিক্ হইতে দেখিতে গেলে উহা ব্যর্থ হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি ধর্ম প্রচলিত আছে, যেগুলির মধ্যে এই ভাবটি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান যে, সকল সম্প্রদায়ই বাঁচিয়া থাকুক; কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন একটি নিজস্ব তাৎপর্য, কোন একটি মহান্ ভাব আছে, কাজেই উহা জগতের কল্যাণের জন্য আবশ্যক এবং উহাকে পোষণ করা উচিত। বর্তমান কালেও এই ধারণাটি আধিপত্য লাভ করিতেছে এবং ইহাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টাও চলিতেছে। এই-সকল চেষ্টা সকল সময়ে আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় না, বা যোগ্যতা দেখাইতে পারে না। শুধু তাহাই নয়, বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, আমরা আরও ঝগড়া বাড়াইয়া তুলিতেছি।

এক্ষণে ধর্মান্ধ মতবাদ-অবলম্বনে আলোচনা ছাড়িয়া বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান ধর্মে একটা প্রবল জীবনীশক্তি রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে, তাঁহারা এ-বিষয়ে কিছু জানেন না, কিন্তু অজ্ঞতার কথা তুলিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যদি কোন লোক বলে, 'বহির্জগতে কি হইতেছে না হইতেছে, আমি কিছুই জানি না, অতএব বহির্জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই মিথ্যা'; তাহা হইলে তাহাকে মার্জনা করা চলে না। এখন আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সমগ্র জগতে অধ্যাত্মচিন্তার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে, পৃথিবীর একটিও মুখ্য ধর্ম মরে নাই; শুধু তাহাই নয়, এগুলির প্রত্যেকটিই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুরা বিস্তার লাভ করিতেছে এবং য়াহুদীগণও সংখ্যায় অধিক হইতেছে, এবং সংখ্যায় তাহারা দ্রুত বর্ধিত হইয়া সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ায় য়াহুদীধর্মের গণ্ডী দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

একটিমাত্র ধর্ম—একটি প্রধান প্রাচীন ধর্ম ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়াছে। তাহা প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম—জরাথুষ্ট্র-ধর্ম। মুসলমানদের পারস্যবিজয়কালে প্রায় এক লক্ষ পারস্যবাসী ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের কেহ কেহ প্রাচীন পারস্যদেশেই থাকিয়া গিয়াছিল। যাহারা পারস্যে ছিল, তাহারা ক্রমাগত মুসলমানদিগের নির্যাতনের ফলে ক্ষয় পাইতে পাইতে এখন বড়জোর দশ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ভারতে তাহাদের সংখ্যা প্রায় আশি হাজার; কিন্তু তাহারা আর বাড়িতেছে না। অবশ্য গোড়াতেই তাহাদিগের একটি অসুবিধা রহিয়াছে—তাহারা অপর কাহাকেও নিজেদের ধর্মভুক্ত করে না। আবার ভারতে এই মুষ্টিমেয় সমাজেও স্বগোত্রীয় নিকট সম্পর্কীয়দের মধ্যে বিবাহরূপ ঘোরতর অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত থাকায় তাহারা বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই একটিমাত্র ধর্ম ব্যতীত অপর সকল প্রধান প্রধান ধর্মই জীবিত রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টি-লাভ করিতেছে। আর আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মই অতি পুরাতন, তাহাদের একটিও বর্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই গঙ্গা ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। একটিও প্রধান ধর্ম

ইওরোপ বা আমেরিকায় উদ্ভূত হয় নাই—একটিও নয়; প্রত্যেক ধর্মই এশিয়াসম্ভূত এবং তাহাও আবার পৃথিবীর ঐ অংশটুকুর মধ্যে। 'যোগ্যতম ব্যক্তি বা বস্তুই বাঁচিয়া থাকিবে'—আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই-সকল ধর্ম যে এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এখনও তাহারা কতকগুলি লোকের পক্ষে উপযোগী; তাহারা যে কেন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার কারণ আছে—তাহারা বহু লোকের উপকার করিতেছে। মুসলমানদিগকে দেখ, তাহারা দক্ষিণ-এশিয়ার কতকগুলি স্থানে কেমন বিস্তারলাভ করিতেছে, এবং আফ্রিকায় আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বৌদ্ধগণ মধ্য-এশিয়ায় বরাবর বিস্তারলাভ করিতেছে। য়াহুদীদের মত হিন্দুগণও অপরকে নিজধর্মে গ্রহণ করে না, তথাপি ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতি হিন্দুধর্মের ভিতর আসিয়া পড়িতেছে এবং হিন্দুদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টধর্মও যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন; তবে আমার যেন মনে হয়, চেষ্টার অনুরূপ ফল হইতেছে না। খ্রীষ্টানদের প্রচারকার্যে একটি ভয়ানক দোষ আছে এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান মাত্রেই এই দোষ বিদ্যমান। শতকরা নব্বই ভাগ শক্তি প্রতিষ্ঠানযন্ত্রের পরিচালনাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কারণ প্রতিষ্ঠানসুলভ বিধি-ব্যবস্থা বড় বেশী। প্রচারকার্যটা প্রাচ্য লোকেরাই বরাবর করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, যুদ্ধসজ্জা, রাজ্যশাসন প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে করিবে, কিন্তু ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্রে তাহারা প্রাচ্যদিগের কাছে ঘেঁষিতেও পারে না, কারণ ইহা বরাবর তাহাদেরই কাজ ছিল বলিয়া তাহারা ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাহারা অতিরিক্ত বিধিব্যবস্থার পক্ষপাতী নয়।

অতএব মনুষ্যজাতির বর্তমান ইতিহাসে ইহা একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, পূর্বোক্ত সকল প্রধান প্রধান ধর্মই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টিলাভ করিতেছে। এই ঘটনার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে, এবং সর্বজ্ঞ পরমকারুণিক সৃষ্টিকর্তার যদি ইহাই ইচ্ছা হইত যে, ইহাদের একটিমাত্র ধর্ম থাকুক এবং অবশিষ্ট সবগুলিই বিনষ্ট হউক, তাহা হইলে উহা বহু পূর্বেই সংসাধিত হইত। আর যদি এই-সকল ধর্মের মধ্যে একটিমাত্র ধর্মই সত্য এবং অপরগুলি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে ঐ সত্য ধর্মই এতদিনে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত

করিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই; উহাদের কোনটিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করে নাই। সকল ধর্মই এক সময়ে উন্নতির দিকে, আবার অন্য সময়ে অবনতির দিকে যায়। আর ইহাও ভাবিয়া দেখ, তোমাদের দেশে ছয় কোটি লোক আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র দুই কোটি দশ লক্ষ কোন-না-কোন প্রকার ধর্মভুক্ত। সুতরাং সব সময়েই ধর্মের উন্নতি হয় না। সম্ভবতঃ সকল দেশেই—গণনা করিলে দেখিতে পাইবে, ধর্মগুলির কখনও উন্নতি আবার কখনও অবনতি হইতেছে। সম্প্রদায়ের সংখ্যাও সর্বদা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের এই দাবী যদি সত্য হইত যে, সমুদয় সত্য উহাতেই নিহিত এবং ঈশ্বর সেই নিখিল সত্য কোন গ্রন্থবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকেই দিয়াছেন—তবে জগতে এত সম্প্রদায় হইল কিরূপে? পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই পুস্তককে ভিত্তি করিয়া কুড়িটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ঈশ্বর যদি কয়েকখানি পুস্তকেই সমগ্র সত্য নিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঝগড়া করিবার জন্য তিনি কখনই আমাদিগকে সেগুলি দেন নাই, কিন্তু বস্তুতঃ দাঁড়াইতেছে তাহাই। কেন এরূপ হয়? যদি ঈশ্বর বাস্তবিকই ধর্মবিষয়ক সমস্ত সত্য একখানি পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে দিতেন, তাহা হইলে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, কারণ কেহই সে গ্রন্থ বুঝিতে পারিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাইবেল ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত যাবতীয় সম্প্রদায়ের কথা ধরুন; প্রত্যেক সম্প্রদায় ঐ একই গ্রন্থ তাহার নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে যে, কেবল সেই উহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে আর অপর সকলে ভ্রান্ত। প্রত্যেক ধর্ম-সম্বন্ধেই এই কথা। মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, হিন্দুদের মধ্যে তো শত শত। এখন আমি যে-সকল ঘটনা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি, এগুলির উদ্দেশ্য—আমি দেখাইতে চাই যে, ধর্ম-বিষয়ে যতবারই সমুদয় মনুষ্যজাতিকে এক প্রকার চিন্তার মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ততবারই উহা বিফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। এমন কি, বর্তমান কালেও নূতন মত-প্রবর্তক মাত্রেই দেখিতে পান যে, তিনি তাঁহার অনুবর্তিগণের নিকট হইতে কুড়ি মাইল দূরে সরিয়া যাইতে না যাইতে তাহারা কুড়িটি দল গঠন করিয়া বসিয়াছে। আপনারা সব সময়েই এইরূপ ঘটিতে দেখিতে পান। ইহা ধ্রুব সত্য যে, সকল লোককে একই প্রকার ভাব গ্রহণ করান চলে না এবং

আমি ইহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি কোন সম্প্রদায়ের বিরোধী নই, বরং নানা সম্প্রদায় রহিয়াছে বলিয়া আমি খুশী এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা—তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাক। ইহার কারণ কি? কারণ শুধু এই যে, যদি আপনি আমি এবং এখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলে ঠিক একই প্রকার ভাবরাশি চিন্তা করি, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়ই থাকিবে না। দুই বা ততোধিক শক্তির সংঘর্ষ হইলেই গতি সম্ভব, ইহা সকলেই জানেন। সেইরূপ চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত হইতেই—চিন্তার বৈচিত্র্য হইতেই নূতন চিন্তার উদ্ভব হয়। এখন আমরা সকলেই যদি একই প্রকার চিন্তা করিতাম, তাহা হইলে আমরা যাদুঘরের মিশরদেশীয় 'মামি'তে (mummies) পরিণত হইয়া শুধু তাহাদেরই মত পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম—তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই হইত না। বেগবতী জীবন্ত নদীতেই ঘূর্ণাবর্ত থাকে, বদ্ধ ও স্রোতহীন জলে আবর্ত হয় না। যখন ধর্মগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন আর সম্প্রদায়ও থাকিবে না; তখন শ্মশানের পূর্ণ শান্তি ও সাম্য বিরাজ করিবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মানুষ চিন্তা করিবে, ততদিন সম্প্রদায়ও থাকিবে। বৈষম্যই জীবনের চিহ্ন এবং বৈষম্য থাকিবেই। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে জগতে যত মানুষ আছে, ততগুলি সম্প্রদায় গঠিত হউক, যেন ধর্মরাজ্যে প্রত্যেকে তাহার নিজের পথে—তাহার ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে চলিতে পারে।

কিন্তু এই ধারা চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে চিন্তা করে, কিন্তু এই স্বাভাবিক ধারা বরাবরই বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এইজন্য সাক্ষাৎভাবে তরবারি ব্যবহৃত না হইলেও অন্য উপায় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নিউ ইয়র্কের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক কি বলিতেছেন, শুনুন—তিনি প্রচার করিতেছেন যে, ফিলিপাইনবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, কারণ তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দিবার উহাই একমাত্র উপায়! তাহারা ইতঃপূর্বেই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রেসবিটেরিয়ান করিতে চান এবং ইহার জন্য তিনি রক্তপাতজনিত ঘোর পাপরাশি স্বজাতির স্কন্ধে চাপাইতে উদ্যত। কি ভয়ানক! আবার এই ব্যক্তিই তাঁহার দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক এবং বিদ্যায় শীর্ষস্থানীয়। যখন এইরূপ একজন লোক

সর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকার কদর্য প্রলাপবাক্য বলিয়া যাইতে লজ্জাবোধ করে না, তখন জগতের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন, বিশেষতঃ যখন আবার তাহার শ্রোতৃবৃন্দ তাহাকে উৎসাহ দিতে থাকে, তখন ভাবিয়া দেখুন জগতের স্বরূপটা কি! ইহাই কি সভ্যতা? ইহা ব্যাঘ্র, নরখাদক ও অসভ্য বন্যজাতির সেই চিরাভ্যস্ত রক্তপিপাসা বৈ আর কিছুই নয়, শুধু আবার নূতন নামে ও নূতন অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। এতদ্ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? বর্তমান কালেই যদি ঘটনা এইরূপ হয়, তবে ভাবিয়া দেখুন, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়গুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত, সেই প্রাচীনকালে জগৎকে কি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাইতে হইত! ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমাদের শাদূর্লসদৃশ মনোবৃত্তি সুপ্ত রহিয়াছে মাত্র—ঐ মনোবৃত্তি একেবারে মরে নাই। সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহা লাফাইয়া উঠে এবং পূর্বের মত নিজ নখর ও বিষদন্ত ব্যবহার করে। তরবারি অপেক্ষাও—জড়পদার্থ নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষাও ভীষণতর অস্ত্রশস্ত্র আছে; যাহারা ঠিক আমাদের মতাবলম্বী নয়, তাহাদের প্রতি এখন অবজ্ঞা, সামাজিক ঘৃণা ও সমাজ হইতে বহিষ্করণরূপ ভীষণ মর্মভেদী অস্ত্র-সকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কেন সকলে যে ঠিক আমার মত চিন্তা করিবে?—আমি তো ইহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমি যদি বিচারশীল মানুষ হই, তাহা হইলে সকলে যে ঠিক আমার ভাবে ভাবিত নয়, ইহাতে আমার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আমি শ্মশানতুল্য দেশে বাস করিতে চাই না; আমি মানুষেরই মত থাকিতে চাই—মানুষেরই মধ্যে। চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই মতভেদ থাকিবে; কারণ পার্থক্যই চিন্তার প্রথম লক্ষণ। আমি যদি চিন্তাশীল হই, তাহা হইলে আমার অবশ্যই এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছা হওয়া উচিত, যেখানে মতের পার্থক্য থাকিবে।

তারপর প্রশ্ন উঠিবে, এই-সকল বৈচিত্র্য কি করিয়া সত্য হইতে পারে? কোন বস্তু সত্য হইলে তাহার বিপরীত বস্তুটা মিথ্যা হইবে। একই সময়ে দুইটি বিরুদ্ধ মত কি করিয়া সত্য হইতে পারে? আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাই। কিন্তু আমি প্রথমে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর ধর্মগুলি কি বাস্তবিকই একান্ত বিরোধী? যে-সকল বাহ্য আচারে

বড় বড় চিন্তাগুলি আবৃত থাকে, আমি সে-সকলের কথা বলিতেছি না। নানা ধর্মে যে-সকল বিবিধ মন্দির, ভাষা, ক্রিয়াকাণ্ড, শাস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার হইয়া থাকে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না; আমি প্রত্যেক ধর্মের ভিতরকার প্রাণবস্তুর কথাই বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্মের পশ্চাতে একটি করিয়া সারবস্তু বা 'আত্মা' আছে; এবং এক ধর্মের আত্মা অন্য ধর্মের আত্মা হইতে পৃথক্ হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি একান্ত বিরোধী? তাহারা পরস্পরকে খণ্ডন করে, না একে অপরের পূর্ণতা সম্পাদন করে?—ইহাই প্রশ্ন। আমি যখন নিতান্ত বালক ছিলাম, তখন হইতে এই প্রশ্নটির আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি এবং সারা জীবন ধরিয়া উহারই আলোচনা করিতেছি। আমার সিদ্ধান্ত হয়তো আপনাদের কোন উপকারে আসিতে পারে, এই মনে করিয়া উহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। আমার বিশ্বাস, তাহারা পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেক ধর্ম যেন মহান্ সার্বভৌম সত্যের এক-একটি অংশ লইয়া তাহাকে বাস্তব রূপ প্রদান করিতে এবং আদর্শে পরিণত করিতে উহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছে। সুতরাং ইহা মিলনের ব্যাপার—বর্জনের নয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। এক-একটি বড় ভাব লইয়া সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে, এবং আদর্শগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপেই মানবজাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। মানুষ কখনও ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় না, পরন্তু সত্য হইতেই সত্যে গমন করিয়া থাকে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরূঢ় হইয়া থাকে—কিন্তু কখনও ভ্রম হইতে সত্যে নয়। পুত্র হয়তো পিতা অপেক্ষা সমধিক গুণশালী হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া পিতা যে কিছু নন, তাহা তো নয়। পুত্রের মধ্যে পিতা তো আছেনই, অধিকন্তু আরও কিছু আছে। আপনার বর্তমান জ্ঞান যদি আপনার বাল্যাবস্থার জ্ঞান হইতে অনেক বেশী হয়, তাহা হইলে কি আপনি এখন সেই বাল্যাবস্থাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন? আপনি কি সেই অতীত অবস্থার দিকে তাকাইয়া উহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিবেন? বুঝিতেছেন না, আপনার সেই বাল্যকালের জ্ঞানই আরও কিছু অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট হইয়া বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

আবার ইহা তো সকলেই জানেন যে, একই জিনিষকে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়া প্রায় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সকল সিদ্ধান্ত একই বস্তুর আভাস

দিয়া থাকে। মনে করুন, এক ব্যক্তি সূর্যের দিকে গমন করিতেছে এবং সে যেমন অগ্রসর হইতেছে, অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্যের এক একটি ফটোগ্রাফ লইতেছে। যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে, তখন সূর্যের অনেকগুলি ফটো আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিবে। আমরা দেখিতে পাইব তাহাদের কোন দুইখানি ঠিক এক রকমের নয়, কিন্তু এ-কথা কে অস্বীকার করিবে যে, এগুলি একই সূর্যের ফটো—শুধু ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে গৃহীত? বিভিন্ন কোণ হইতে এই গীর্জাটির চারিখানি ফটো লইয়া দেখুন, তাহারা কত পৃথক্ দেখাইবে; অথচ তাহারা এই গীর্জার প্রতিকৃতি। এইরূপে আমরা একই সত্যকে এমন সব দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতেছি, যাহা আমাদের জন্ম, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আমরা সত্যকেই দেখিতেছি, তবে এই-সমুদয় অবস্থার মধ্য দিয়া সেই সত্যের যতটা দর্শন পাওয়া সম্ভব, ততটাই পাইতেছি—তাহাকে আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করিতেছি, আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতেছি এবং নিজ নিজ মন দ্বারা ধারণা করিতেছি। আমরা সত্যের শুধু সেইটুকুই বুঝিতে পারি, যেটুকুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে বা যতটুকু গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের আছে। এই হেতুই মানুষে মানুষে প্রভেদ হয়; এমন কি, কখনও কখনও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে; অথচ আমরা সকলেই সেই এক সর্বজনীন সত্যের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব আমার ধারণা এই যে, ভগবানের বিধানে এই-সকল ধর্ম বিবিধ শক্তিরূপে বিকশিত হইয়া মানবের কল্যাণ-সাধনে নিরত রহিয়াছে; তাহাদের একটিও মরিতে পারে না—একটিকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। যেমন কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে বিনষ্ট করা যায় না, সেইরূপ এই আধ্যাত্মিক শক্তিনিচয়ের কোন একটিরও বিনাশ সাধন করিতে পারা যায় না। আপনারা দেখিয়াছেন, প্রত্যেক ধর্মই জীবিত রহিয়াছে। সময়ে সময়ে ইহা হয়তো উন্নতি বা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কোন সময়ে হয়তো ইহার সাজসজ্জার অনেকটা হ্রাস পাইতে পারে, কখনও উহা রাশীকৃত সাজসজ্জায় মণ্ডিত হইতে পারে; কিন্তু তথাপি উহার প্রাণবস্তু সর্বদাই অব্যাহত রহিয়াছে; উহা কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মের সেটি অন্তর্নিহিত আদর্শ, তাহা কখনই নষ্ট হয় না; সুতরাং প্রত্যেক ধর্মই সজ্ঞানে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে।

আর সেই সার্বভৌম ধর্ম, যাহার সম্বন্ধে সকল দেশের দার্শনিকগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি কত কল্পনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা এখানেই রহিয়াছে। সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব যেমন পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, সেইরূপ সার্বভৌম ধর্মও রহিয়াছে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা নানা দেশ পর্যটন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নিজেদের ভাই-বোনের পরিচয় পান নাই? আমি তো পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁহাদিগকে পাইয়াছি। ভ্রাতৃভাব পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা ইহা দেখিতে না পাইয়া নূতন-ভাবে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চীৎকার করিয়া বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। সার্বভৌম ধর্মও বর্তমান রহিয়াছে। পুরোহিতকুল এবং অন্যান্য যে-সব লোক বিভিন্ন ধর্ম প্রচার করিবার ভাব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঘাড়ে লইয়াছেন, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া একবার কিছুক্ষণের জন্য প্রচারকার্য বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঐ সার্বভৌম ধর্ম পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। তাঁহারা বরাবরই উহাকে প্রতিহত করিতেছেন, কারণ উহাতেই তাঁহাদের লাভ। আপনারা দেখিতে পান, সকল দেশের পুরোহিতরাই অতিশয় গোঁড়া। ইহার কারণ কি? খুব কম পুরোহিতই আছেন, যাঁহারা জনসাধারণকে পরিচালিত করেন; তাঁহাদের অধিকাংশই জনসাধারণ দ্বারা চালিত হন এবং তাহাদের ভৃত্য ও ক্রীতদাস হইয়া পড়েন। যদি কেহ বলে, ‘ইহা শুষ্ক’, তাঁহারাও বলিবেন, ‘হাঁ শুষ্ক’, যদি কেহ বলে, ‘ ইহা কালো’, তাঁহারাও বলিবেন, ‘হাঁ, ইহা কালো।’ যদি জনসাধারণ উন্নত হয়, তাহা হইলে পুরোহিতরাও উন্নত হইতে বাধ্য। তাঁহারা পিছাইয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং পুরোহিতদিগকে গালি দিবার পূর্বে—পুরোহিতগণকে গালি দেওয়া আজকাল একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আপনাদের নিজেদেরই গালি দেওয়া উচিত। আপনারা শুধু তেমন জিনিষই পাইতে পারেন, যাহার জন্য আপনারা যোগ্য। যদি কোন পুরোহিত নূতন নূতন উন্নত ভাব শিখাইয়া আপনাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার দশা কি হইবে? হয়তো তাঁহার পুত্রকন্যা অনাহারে মারা যাইবে এবং তাঁহাকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে হইবে। আপনাদিগকে যে-সকল জাগতিক বিধি মানিতে হয়, তাঁহাকেও তাহাই করিতে হয়। তিনি বলেন, ‘আপনারা যদি চলেন, তাহা হইলে চলুন, চলাই যাক।’ অবশ্য

এমন বিরল দুই চারি জন উচ্চ ভাবের মানুষ আছেন, যাঁহারা লোকমতকে ভয় করেন না। তাঁহারা সত্য অনুভব করেন এবং একমাত্র সত্যকেই সার জ্ঞান করেন। সত্য তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে—যেন তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। তাঁহারা কখনও পিছনে ফিরিয়া চাহেন না এবং লোকমত গ্রাহ্যও করেন না। তাঁহাদের নিকট একমাত্র ভগবানই সত্য; তিনিই তাঁহাদের পথ- প্রদর্শক জ্যোতি এবং তাঁহারা সেই জ্যোতিরই অনুসরণ করেন।

এদেশে (আমেরিকায়) আমার জনৈক মর্মন (Mormon) ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি আমাকে তাঁহার মতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, 'আপনার মতের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আমরা একমত নই। আমি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আপনি বহুবিবাহের পক্ষপাতী। ভাল কথা, আপনি ভারতে আপনার মত প্রচার করিতে যান না কেন?' ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'কি রকম, আপনি বিবাহের আদৌ পক্ষপাতী নন, আর আমি বহুবিবাহের পক্ষপাতী; তথাপি আপনি আমাকে আপনার দেশে যাইতে বলিতেছেন!' আমি বলিলাম, 'হাঁ, আমার দেশবাসীরা সকল প্রকার ধর্মমতই শুনিয়া থাকেন—তাহা যে-দেশ হইতেই আসুক না কেন। আমার ইচ্ছা আপনি ভারতে যান; কারণ প্রথমতঃ আমি সম্প্রদায়সমূহের উপকারিতায় বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়তঃ সেখানে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বর্তমান সম্প্রদায়গুলির উপর আদৌ সন্তুষ্ট নন, এবং এই হেতু তাঁহারা ধর্মের কোন ধারই ধারে না; হয়তো তাঁহাদের কেহ কেহ আপনার মত গ্রহণ করিতে পারেন।' সম্প্রদায়ের সংখ্যা যতই অধিক হইবে, লোকের ধর্মলাভ করিবার সম্ভাবনা ততই বেশী হইবে। যে হোটেলে সব রকম খাবার পাওয়া যায়, সেখানে সকলেরই ক্ষুধাতৃপ্তির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আমার ইচ্ছা, সকল দেশে সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়িয়া যাক, যাহাতে আরও বেশী লোক ধর্মজীবনলাভের সুবিধা পাইতে পারে। এইরূপ মনে করিবেন না যে, লোকে ধর্ম চায় না। আমি তাহা বিশ্বাস করি না। তাহাদের যাহা প্রয়োজন, প্রচারকেরা ঠিক তাহা দিতে পারে না। যে লোক নাস্তিক, জড়বাদী বা ঐ-রকম একটা কিছু বলিয়া ছাপমারা হইয়া গিয়াছে, তাহারও যদি এমন কোন লোকের

সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি তাহাকে ঠিক তাহার মনের মত আদর্শটি দেখাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সে হয়তো সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন লোক হইয়া উঠিবে। আমরা বরাবর যেভাবে খাইতে অভ্যস্ত, সেভাবেই খাইতে পারি। দেখুন না, আমরা হিন্দুরা—হাত দিয়া খাইয়া থাকি, আপনাদের অপেক্ষা আমাদের আঙুল বেশী তৎপর, আপনারা ঠিক ঐ-ভাবে আঙুল নাড়িতে পারেন না। শুধু খাবার দিলেই হইল না, আপনাকে উহা নিজের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আপনাকে শুধু কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাব দিলেই চলিবে না, আপনার পরিচিত ধারায় সেগুলি আপনার নিকট আসা চাই। সেগুলি যদি আপনার নিজের ভাষায় আপনার প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করা হয়, তবেই আপনার সন্তোষ হইবে। এমন কেহ যখন আসেন, যিনি আমার ভাষায় কথা বলেন এবং আমার ভাষায় উপদেশ দেন, আমি তখনই উহা বুঝিতে পারি এবং চিরকালের মত স্বীকার করিয়া লই। ইহা একটা মস্ত বড় বাস্তব সত্য।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কত বিভিন্ন স্তর এবং প্রকৃতির মানব-মন রহিয়াছে এবং ধর্মগুলির উপরেও কি গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। কেহ হয়তো দুই তিনটি মতবাদ বাহির করিয়া বলিয়া বসিবেন যে, তাঁহার ধর্ম সকল লোকের উপযোগী হইয়া উচিত। তিনি একটি ছোট খাঁচা হাতে লইয়া ভগবানের এই জগদ্রূপ চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়া বলেন, 'ঈশ্বর, হস্তী এবং অপর সকলকেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হস্তীটিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়াও ইহার মধ্যে ঢুকাইতে হইবে।' আবার হয়তো এমন কোন সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভাল ভাল ভাব আছে। তাঁহারা বলেন, 'সকলকেই আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইবে!' 'কিন্তু সকলের তো স্থান নাই!' 'কুছ পরোয়া নেই! তাহাদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যেমন করিয়া পার ঢোকাও। কারণ তাহারা যদি না আসে, তাহারা নিশ্চয়ই উৎসন্ন যাইবে।' আমি এমন কোন প্রচারকদল বা সম্প্রদায় কোথাও দেখিলাম না, যাঁহারা স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখেন, 'আচ্ছা, লোকে যে আমাদের কথা শোনে না, ইহার কারণ কি?' এরূপ না করিয়া তাঁহারা কেবল লোকদের অভিশাপ দেন আর বলেন, 'লোকগুলো ভারি পাজী।' তাঁহারা একবারও জিজ্ঞাসা করেন না, 'কেন লোকে আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না? কেন আমি তাহাদিগকে সত্য

দেখাইতে পারিতেছি না? কেন আমি তাহাদের বুঝিবার মত ভাষায় কথা বলিতে পারি না? কেন আমি তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে পারি না?' প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের আরও সুবিবেচক হওয়া আবশ্যক। এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে, লোকে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে না, তখন যদি কাহাকেও গালাগালি দিতে হয় তো তাঁহাদের নিজেদের গালাগালি দেওয়া উচিত। কিন্তু সব সময়ে লোকেরই যত দোষ! তাঁহারা কখনও নিজেদের সম্প্রদায়কে প্রসারিত করিয়া সকল লোকের উপযোগী করিবার চেষ্টা করেন না। অতএব অংশ নিজেকে পূর্ণ বলিয়া সর্বদা দাবী করা-রূপ, ক্ষুদ্র সসীম বস্তু নিজেকে অসীম বলিয়া সর্বদা জাহির করা-রূপ এত সঙ্কীর্ণতা জগতে কেন চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ আমরা অতি সহজেই দেখিতে পাই। একবার সেই-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির কথা ভাবিয়া দেখুন, যেগুলি মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে ভ্রান্ত মানব-মস্তিষ্ক হইতে জাত হইয়াছে, অথচ ভগবানের অনন্ত সত্যের সমস্ত জানিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া উদ্ধত স্পর্ধা করে। কতদূর প্রগল্‌ভতা একবার দেখুন! ইহা হইতে আর কিছু না হউক, এইটুকু বোঝা যায় যে, মানুষ কত আত্মম্ভরী! আর এই প্রকার দাবী যে বরাবরই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা কিছুই আশ্চর্য নয় এবং প্রভুর কৃপায় উহা চিরকালই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই বিষয়ে মুসলমানেরা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাহারা তরবারির সাহায্যে প্রত্যেক পদ অগ্রসর হইয়াছিল—তাহাদের এক হস্তে ছিল কোরান, অপর হস্তে তরবারি; 'হয় কোরান গ্রহণ কর, নতুবা মৃত্যু আলিঙ্গন কর। আর অন্য উপায় নাই!' ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, তাহাদের অভূতপূর্ব সাফল্য হইয়াছিল। ছয়শত বৎসর ধরিয়া কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই; কিন্তু পরে এমন এক সময় আসিল, যখন তাহাদিগকে অভিযান থামাইতে হইল। অপর কোন ধর্ম যদি ঐরূপ পন্থা অনুসরণ করে, তবে তাহারও একই দশা হইবে। আমরা এই প্রকার শিশুই বটে! আমরা মানব-প্রকৃতির কথা সর্বদাই ভুলিয়া যাই। আমাদের জীবন-প্রভাতে আমরা মনে করি যে, আমাদের অদৃষ্ট একটা কিছু অসাধারণ রকমের হইবে এবং কিছুতেই এ-বিষয়ে আমাদের অবিশ্বাস আসে না। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় আমাদের চিন্তা অন্যরূপ দাঁড়ায়। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। প্রথমাবস্থায় যখন ধর্মসম্প্রদায়গুলি একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখন ঐগুলি মনে করে,

কয়েক বৎসরেই সমগ্র মানবজাতির মন বদলাইয়া দিবে এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার জন্য শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করিতে থাকে। পরে যখন অকৃতকার্য হয়, তখন ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের চক্ষু খুলিতে থাকে। দেখা যায়, ঐগুলি যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, আর ইহাই জগতের পক্ষে অশেষ কল্যাণজনক। একবার ভাবিয়া দেখুন, যদি এই গোঁড়া সম্প্রদায়সমূহের কোন একটি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িত, তাহা হইলে আজ মানুষের কি দশা হইত! ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তাহারা কৃতকার্য হয় নাই। তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একটি মহান্ সত্যের প্রতিনিধি; প্রত্যেক ধর্মই কোন একটি বিশেষ উচ্চাদর্শের প্রতিভূ—উহাই তাহার প্রাণবস্তু। একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছেঃ কতকগুলি রাক্ষসী ছিল; তাহারা মানুষ মারিত এবং নানাপ্রকার অনিষ্টসাধন করিত। কিন্তু তাহাদিগকে কেহই মারিতে পারিত না। অবশেষে একজন খুঁজিয়া বাহির করিল যে, তাহাদের প্রাণ কতকগুলি পাখীর মধ্যে রহিয়াছে এবং যতক্ষণ ঐ পাখীগুলি বাঁচিয়া থাকিবে, ততক্ষণ কেহই রাক্ষসীদের মারিতে পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকেরও যেন এইরূপ এক-একটি প্রাণ-পক্ষী আছে, উহার মধ্যেই আমাদের প্রাণবস্তুটি রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের একটি আদর্শ—একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে, যেটি জীবনে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষই এইরূপ এক-একটি আদর্শ, এইরূপ এক-একটি উদ্দেশ্যের প্রতিমূর্তি। আর যাহাই নষ্ট হউক না কেন, যতক্ষণ সেই আদর্শটি ঠিক আছে, যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য অটুট রহিয়াছে, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার বিনাশ নাই। সম্পদ আসিতে বা যাইতে পারে, বিপদ পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু আপনি যদি সেই লক্ষ্য অটুট রাখিয়া থাকেন, কিছুই আপনার বিনাশসাধন করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধ হইতে পারেন, এমন কি শতায়ু হইতে পারেন, কিন্তু যদি সেই উদ্দেশ্য আপনার মনে উজ্জ্বল এবং সতেজ থাকে, তাহা হইলে কে আপনাকে বধ করিতে সমর্থ? কিন্তু যখন সেই আদর্শ হারাইয়া যাইবে এবং সেই উদ্দেশ্য বিকৃত হইবে, তখন আর কিছুতেই আপনার রক্ষা নাই, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সমস্ত শক্তি মিলিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। জাতি আর কি—ব্যষ্টির সমষ্টি বৈ তো নয়? সুতরাং প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, যেটি বিভিন্ন জাতিসমূহের সুশৃঙ্খল

অবস্থিতির পক্ষে বিশেষ দরকার, এবং যতদিন উক্ত জাতি সেই আদর্শকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু যদি ঐ জাতি উক্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন ক্ষীণ হইয়া আসে এবং ইহা অচিরেই অন্তর্হিত হয়।

ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। এই-সকল পুরাতন ধর্ম যে আজিও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এগুলি নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্য অটুট রাখিয়াছে। ধর্মগুলির সমুদয় ভুলভ্রান্তি, বাধাবিঘ্ন, বিবাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও সেগুলির উপর নানাবিধ অনুষ্ঠান ও নির্দিষ্ট প্রণালীর আবর্জনাস্তূপ সঞ্চিত হইলেও প্রত্যেকের প্রাণকেন্দ্র ঠিক আছে, উহা জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে—ধুক্ ধুক্ করিতেছে। ঐ ধর্মগুলির মধ্যে কোন ধর্মই, যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, তাহা হারাইয়া ফেলে নাই। আর সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা চমকপ্রদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুসলমান ধর্মের কথাই ধরুন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ মুসলমান ধর্মকে যত বেশী ঘৃণা করে, এরূপ আর কোন ধর্মকেই করে না। তাহারা মনে করে, এরূপ নিকৃষ্ট ধর্ম আর কখনও হয় নাই। কিন্তু দেখুন, যখনই একজন লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি সমগ্র ইসলামী সমাজ তাহাকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল। এরূপ আর কোন ধর্ম করে না। এদেশীয় একজন রেড ইণ্ডিয়ান যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতানও তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না এবং সে বুদ্ধিমান হইলে যে-কোন উচ্চপদ-লাভে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু এদেশে আমি এ পর্যন্ত এমন একটিও গীর্জা দেখি নাই, যেখানে শ্বেতকায় ব্যক্তি ও নিগ্রো পাশাপাশি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে পারে। এই কথাটি একবার ভাবিয়া দেখুন। ইসলাম ধর্ম তদন্তর্গত সকল ব্যক্তিকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন এইখানেই মুসলমান ধর্মের নিজস্ব বিশেষ মহত্ত্ব। কোরানের অনেকস্থলে মানবজীবন সম্বন্ধে নিছক ইহলৌকিক কথা দেখিতে পাইবেন; তাহাতে ক্ষতি নাই। মুসলমান ধর্ম জগতে যে বার্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে, তাহা সকল মুসলমান-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কার্যে পরিণত এই ভ্রাতৃভাব, ইহাই মুসলমান ধর্মের অত্যাবশ্যক

সারাংশ, এবং স্বর্গ, জীবন প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা, সেগুলি মুসলমান ধর্মের সারাংশ নয়, অন্য ধর্ম হইতে উহাতে ঢুকিয়াছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন—তাহা আধ্যাত্মিকতা। অন্য কোন ধর্মে—পৃথিবীর অপর কোন ধর্মপুস্তকে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে, ইহা দেখিতে পাইবেন না। তাঁহারা এভাবে আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে কোন পার্থিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে না পারে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ভগবৎ সত্তারই সমতুল, এবং আত্মাকে আত্মারূপে বুঝিতে হইলে উহাকে কখনও মানবত্বে পরিণত করা চলে না।

সেই একত্বের ধারণা এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধিই সর্বদা সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। তিনি স্বর্গে বাস করেন ইত্যাদি কথা হিন্দুদের নিকট অসার উক্তি বৈ আর কিছুই নহে—উহা মনুষ্য কর্তৃক ভগবানে মনুষ্যোচিত গুণাবলীর আরোপ মাত্র। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এখনই এবং এইখানেই বর্তমান। অনন্তকালের মধ্যবর্তী যে-কোন মুহূর্ত অপর যে-কোন মুহূর্তেরই মত ভাল। যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, তিনি এখনই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। আমাদের মতে একটা কিছু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেই ধর্মের আরম্ভ হয়; কতকগুলি মতে বিশ্বাসী হওয়া কিংবা বুদ্ধি দ্বারা উহা স্বীকার করা, অথবা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করাকে ধর্ম বলে না। ভগবান্ যদি থাকেন, তবে আপনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি? যদি বলেন, 'না', তবে আপনার তাঁহাতে বিশ্বাস করিবার কি অধিকার আছে? আর যদি আপনার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করুন না কেন? কেন আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন না? ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতা—এই দুইটিই ভারতের মহান্ আদর্শ এবং এ দুইটি ধরিয়া আছে বলিয়াই ভারতের এত ভুলভ্রান্তিতেও বিশেষ কিছু যায় আসে না।

খ্রীষ্টানদিগের প্রচারিত মূল ভাবটিও এইঃ 'অবহিত হইয়া প্রার্থনা কর, কারণ ভগবানের রাজ্য অতি নিকটে।' অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করিয়া প্রস্তুত হও। আর এই ভাব কখনও নষ্ট হইতে

পারে না। আপনাদের বোধ হয় মনে আছে যে, খ্রীষ্টানগণ ঘোর অন্ধকার-যুগেও অতি কুসংস্কারগ্রস্ত খ্রীষ্টান দেশসমূহেও অপরকে সাহায্য করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা প্রভৃতি সৎকার্যের দ্বারা সর্বদা নিজেদের পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা এই লক্ষ্যে স্থির থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের ধর্ম সজীব থাকিবে।

সম্প্রতি আমার মনে একটা আদর্শের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। হয়তো ইহা স্বপ্নমাত্র। জানি না ইহা কখনও জগতে কার্যে পরিণত হইবে কিনা। কিন্তু কঠোর বাস্তবে থাকিয়া মরা অপেক্ষা কখনও কখনও স্বপ্ন দেখাও ভাল। স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশিত হইলেও মহান্ সত্যগুলি অতি উত্তম, নিকৃষ্ট বাস্তব অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ। অতএব একটা স্বপ্নই দেখা যাক না কেন!

আপনারা জানেন যে, মনের নানা স্তর আছে। আপনি হয়তো সহজজ্ঞানে আস্থাবান্ একজন বস্তুতান্ত্রিক যুক্তিবাদী; আপনি আচার-অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না। আপনি চান এমন সব প্রত্যক্ষ ও অকাট্য সত্য, যাহা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত এবং কেবল উহাতেই আপনি সন্তোষলাভ করিতে পারেন। আবার পিউরিটান ও মুসলমানগণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের উপাসনাস্থলে কোন প্রকার ছবি বা মূর্তি রাখিতে দিবেন না। বেশ কথা! কিন্তু আর এক প্রকার লোক আছেন, যিনি একটু বেশী শিল্পকলাপ্রিয়; ঈশ্বরলাভের সহায়রূপে তাঁহার অনেকটা শিল্পকলার প্রয়োজন হয়; তিনি চান সুন্দর সুঠাম নানা সরল ও বক্ররেখা এবং বর্ণ ও রূপ, আর চান ধূপ, দীপ, অন্যান্য প্রতীক ও বাহ্যোপকরণ। আপনি যেমন ঈশ্বরকে যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিও তেমনি তাঁহাকে ঐ-সকল প্রতীকের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন। আর এক প্রকার ভক্তিপ্রবণ লোক আছেন, যাঁহাদের প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। ভগবানের পূজা এবং স্তবস্তুতি করা ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন চিন্তা নাই। তারপর আছেন দার্শনিক, যিনি এই-সকলের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করেন; তিনি মনে করেন, কি সব ব্যর্থ প্রয়াস! ঈশ্বর সম্বন্ধে কি সব অদ্ভুত ধারণা!

তাঁহারা পরস্পরকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু এই জগতে প্রত্যেকেরই একটা স্থান আছে। এই-সকল বিভিন্ন মন, এই-সকল বিচিত্র ভাবাদর্শের প্রয়োজন আছে, যদি কখনও কোন আদর্শ ধর্ম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে, তবে উহাকে এরূপ উদার এবং প্রশস্তহৃদয় হইতে হইবে, যাহাতে উহা এই সকল বিভিন্ন মনের উপযোগী খাদ্য যোগাইতে পারে। ঐ ধর্ম জ্ঞানীর হৃদয়ে দর্শন-সুলভ দৃঢ়তা আনিয়া দিবে, এবং ভক্তের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত করিবে। আনুষ্ঠানিককে ঐ ধর্ম উচ্চতম প্রতীকোপাসনালভ্য সমুদয় ভাবরাশিদ্বারা চরিতার্থ করিবে, এবং কবি যতখানি হৃদয়োচ্ছ্বাস ধারণ করিতে পারে, কিংবা আর যাহা কিছু গুণরাশি আছে, তাহার দ্বারা সে কবিকে পূর্ণ করিবে। এইরূপ উদার ধর্মের সৃষ্টি করিতে হইলে আমাদিগকে ধর্মসমূহের অভ্যুদয়কালে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং ঐগুলি সবই গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—বর্জন নয়। কেবল পরমতসহিষ্ণুতা নয়—উহা অনেক সময়ে ঈশ্বর-নিন্দারই নামান্তর মাত্র; সুতরাং আমি উহাতে বিশ্বাস করি না। আমি 'গ্রহণ'-এ বিশ্বাসী। আমি কেন পরধর্মসহিষ্ণু হইতে যাইব? পরধর্মসহিষ্ণুতার মানে এই যে, আমার মতে আপনি অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বাঁচিয়া থাকিতে বাধা দিতেছি না। তোমার আমার মত লোক কাহাকেও দয়া করিয়া বাঁচিতে দিতেছে, এইরূপ মনে করা কি ভগবদ্বিধানে দোষারোপ করা নয়? অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলিয়া মানি এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক সম্প্রদায় যে-ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ঠিক সেই ভাবে তাঁহার আরাধনা করি। আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রীষ্টানদিগের গীর্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাঁহার ধর্মের শরণ লইব, এবং অরণ্যে গমন করিয়া সেই-সব হিন্দুর পার্শ্বে ধ্যানে মগ্ন হইব, যাঁহারা সকলের হৃদয়-কন্দর-উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট।

শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম আসিতে পারে তাহাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব। ঈশ্বরের বিধিশাস্ত্র কি শেষ হইয়া গিয়াছে, অথবা উহা চিরকালব্যাপী অভিব্যক্তিরূপে আজও আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে? জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিসমূহের এই যে লিপি, ইহা এক অদ্ভুত পুস্তক। বাইবেল, বেদ ও কোরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ যেন ঐ পুস্তকের এক-একখানি পত্র এবং উহার অসংখ্য পত্র এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেই-সব অভিব্যক্তির জন্য আমি এ-পুস্তক খুলিয়াই রাখিব। আমরা বর্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের অনন্ত ভাবরাশি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিব। অতীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সে-সবই আমরা গ্রহণ করিব, বর্তমানে জ্ঞানালোক উপভোগ করিব এবং ভবিষ্যতেও যাহা উপস্থিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিব। অতীতের ঋষিকুলকে প্রণাম, বর্তমানের মহাপুরুষদিগকে প্রণাম এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে আসিবেন, তাঁহাদের সকলকে প্রণাম।

৬. আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম

অতীতের সুদীর্ঘ ধারার মধ্য দিয়া শত শত যুগের একটি বাণী আমাদের নিকট ভাসিয়া আসিতেছে—সেই বাণী হিমালয় ও অরণ্যের মুনি-ঋষিদের বাণী; সেই বাণী সেমিটিক জাতিদের নিকটও আবির্ভূত হইয়াছিল, বুদ্ধদেব ও অন্যান্য ধর্মবীরগণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল; সেই বাণী সেই-সব মানবের নিকট হইতে আসিতেছে, যাঁহারা এমন এক জ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিলেন, যাহা এই পৃথিবীর আরম্ভ হইতেই মানুষের সহচররূপে বিদ্যমান ছিল; মানুষ যেখানেই যাক, সেখানেই উহা প্রকাশ পায় এবং সর্বদা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে; সেই বাণী এখনও আমাদের নিকট আসিতেছে। এই বাণী সেই-সব পর্বতনিঃসৃত ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনীর মত, যেগুলি কখনও অদৃশ্য এবং কখনও আবার খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে একটি বিশাল শক্তিশালী বন্যায় পরিণত হয়। জগতের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ঈশ্বরাদিষ্ট ও পবিত্রাত্মা নরনারীর মুখ হইতে যে বাণীসমূহ আমরা পাইতেছি, সেগুলি নিজ নিজ শক্তি সম্মিলিত করিয়া আমাদিগকে ভেরীনিনাদে অতীতের বাণীই শুনাইতেছে। আমাদের লব্ধ প্রথম বাণীঃ তোমাদের এবং সকল ধর্মের শান্তি হউক। ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাণী নয়, পরন্তু ঐক্যবদ্ধ ধর্মের কথা। আসুন আমরা প্রথমেই এই বাণীর তাৎপর্য আলোচনা করি।

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ধর্মের ধ্বংস এবার অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার তীব্র আঘাতে পুরাতন কুসংস্কারগুলি চীনামাটির বাসনের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। যাহারা ধর্মকে কেবল মতবাদ ও অর্থশূন্য অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিত, তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল; ধরিয়া রাখার মত কিছুই তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। এক সময়ে ইহা অনিবার্য বলিয়া বোধ হইল যে, জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের উত্তাল তরঙ্গ সম্মুখের সকল বস্তুকে দ্রুতবেগে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। অনেকেই এ বিষয়ে নিরাশ হইল এবং ভাবিল যে, ধর্ম এবার চিরদিনের মত লোপ পাইল। কিন্তু স্রোত আবার

ফিরিয়াছে এবং উহার উদ্ধারের উপায় আসিয়াছে।—সেটি কি? সে উপায়টি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা। বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনে আমরা দেখিতে পাই যে, সেগুলি মূলতঃ এক। বাল্যকালে এই নাস্তিকতার প্রভাব আমার উপরও পড়িয়াছিল এবং এক সময়ে এমন বোধ হইয়াছিল যে, আমাকেও ধর্মের সকল আশা ভরসা ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম অধ্যয়ন করিলাম এবং আশ্চর্য হইলাম, আমাদের ধর্ম যে-সকল মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেয়, অন্যান্য ধর্মও অবিকল সেইগুলিই শিক্ষা দেয়। ইহাতে আমার মনে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইলঃ সত্য কী? এই জগৎ কি সত্য? উত্তর পাইলাম—হাঁ, সত্য। কেন সত্য?—কারণ আমি ইহা দেখিতেছি। যে-সব মনোহর সুললিত কণ্ঠস্বর ও যন্ত্রসঙ্গীত আমরা এইমাত্র শুনিলাম, সে-সব কি সত্য?—হাঁ সত্য; কারণ আমরা তাহা শুনিয়াছি। আমরা জানি যে, মানুষের একটি শরীর আছে, দুটি চক্ষু ও দুইটি কর্ণ আছে এবং তাহার একটি আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও আছে, যাহা আমরা দেখিতে পাই না। এই আধ্যাত্মিক বৃত্তির সাহায্যেই সে বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনের ফলে বুঝিতে পারে যে, ভারতের অরণ্যে ও খ্রীষ্টানদের দেশে যত ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি মূলতঃ এক। ইহার ফলে আমরা এই সত্যেই উপনীত হই যে, ধর্ম মানব-মনের একটি স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন। কোন এক ধর্মকে সত্য বলিতে হইলে অপর ধর্মগুলিকেও সত্য বলিয়া মানিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, আমার ছয়টি আঙুল আছে, কিন্তু অন্য কাহারও ঐরূপ নাই; তাহা হইলে আপনারা বেশ বুঝিতে পারেন যে, ইহা অস্বাভাবিক। কেবল একটি ধর্ম সত্য আর অন্য ধর্মগুলি মিথ্যা—এই বিতণ্ডার সমাধানেও ঐ একই যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। জগতে মাত্র একটি ধর্ম সত্য বলিলে উহা ছয় আঙুল-বিশিষ্ট হাতের মত অস্বাভাবিকই হইবে। সুতরাং দেখা গেল যে, একটি ধর্ম সত্য হইলে অপরগুলিও অবশ্য সত্য হইবে। গৌণ অংশগুলি সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ সেগুলি সব এক। যদি আমার পাঁচ আঙুল সত্য হয়, তবে তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়—তোমার পাঁচ আঙুলও সত্য।

মানুষ যেখানেই থাকুক, তাহার একটি ধর্মবিশ্বাস থাকিবেই, সে তাহার ধর্মভাবের পরিপুষ্টি করিবেই। জগতের বিভিন্ন ধর্ম আলোচনা করিয়া আর একটি সত্য দেখিতে পাওয়া যায়

যে, আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার তিনটি বিভিন্ন স্তর আছে। প্রথমতঃ সকল ধর্মই স্বীকার করে, এই নশ্বর শরীর ছাড়া (মানুষের) আর একটি অংশ বা অন্য কিছু আছে, যাহা শরীরের মত পরিবর্তিত হয় না; তাহা নির্বিকার, শাশ্বত ও অমৃত। কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি ধর্মের মতে—যদিও ইহা সত্য যে, আমাদের একটা অংশ অমর, তথাপি কোন-না-কোন সময়ে ইহার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যাহার আরম্ভ আছে, তাহার নাশ অবশ্য আছে। আমাদের অর্থাৎ আমাদের মূল সত্তার কখনও আরম্ভ হয় নাই, কখনই অন্তও হইবে না। আমাদের সকলের উপরে—এই অনন্ত সত্তারও উপরে 'ঈশ্বর'-পদবাচ্য আর একজন অনাদি পুরুষ আছেন, যাঁহার অন্ত নাই। লোকে জগতের সৃষ্টি ও মানবের আরম্ভের কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু জগতের 'আরম্ভ' কথাটির অর্থ শুধু একটি কল্পের আরম্ভ। ইহা দ্বারা কোথাও সমগ্র বিশ্বজগতের আরম্ভ বুঝায় না। সৃষ্টির যে আরম্ভ থাকিতে পারে—ইহা অসম্ভব। আদিকাল বলিয়া কোন কিছুর ধারণা আপনাদের মধ্যে কেহই করিতে পারেন না। যাহার আরম্ভ আছে, তাহার শেষ আছেই। ভগবদ্গীতা বলেনঃ

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥৮

অর্থাৎ পূর্বে যে আমি ছিলাম না, এমন নয়; তুমি যে ছিলে না, এমন নয়; এই নৃপতিগণ যে ছিলেন না, তাহাও নয় এবং আমরা সকলে যে পরে থাকিব না, তাহাও নয়। যেখানেই সৃষ্টির প্রারম্ভের কথার উল্লেখ আছে, সেখানে কল্পারম্ভই বুঝিতে হইবে। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা চির অমর।

আত্মার এই ধারণার সহিত ইহার পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ধারণা আমরা দেখিতে পাই। আত্মা স্বয়ং পূর্ণ। য়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ এ-কথা স্বীকার করে যে, মানুষ প্রথমে পবিত্র ছিল। মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা নিজেকে অশুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে তাহার সেই পুরাতন প্রকৃতি অর্থাৎ পবিত্র স্বভাবকে আবার পাইতে হইবে। কেহ কেহ এই-সকল কথা রূপকাকারে, গল্পচ্ছলে ও প্রতীক-অবলম্বনে বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এই কথাগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, উঁহাদের সকলেরই এই এক উপদেশ—আত্মা

স্বভাবতঃ পূর্ণ এবং মানুষকে তাহার সেই মৌলিক শুদ্ধ স্বভাব পুনরায় লাভ করিতেই হইবে। কি উপায়ে?—ঈশ্বরানুভূতির দ্বারা; ঠিক যেমন য়াহুদীদের বাইবেল বলে, 'ঈশ্বরের পুত্রের মধ্য দিয়া না হইলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।' ইহা হইতে কি বুঝা যায়? ঈশ্বরদর্শনই সকল মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। পিতার সহিত এক হইবার পূর্বে পুত্রত্ব অবশ্য আসিবে। মনে রাখিতে হইবে, মানুষ তাহার নিজ কর্মদোষে তাহার শুদ্ধ ভাব হারাইয়াছে। আমরা যে কষ্ট পাই, তাহা আমাদের নিজেদের কর্মফলে। ইহার জন্য ভগবান্ দোষী নন। এই সব ধারণার সহিত পুনর্জন্মবাদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। পাশ্চাত্যগণের হস্তে অঙ্গহানি হওয়ার পূর্বে এই মতবাদটি সর্বজনীন ছিল।

আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে স্বীকার করেন নাই। 'মানবাত্মা অনাদি অনন্ত'—এই অপর মতবাদটির সহিত জন্মান্তরবাদের ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে চলিয়া আসিতেছে। যাহা কোনখানে আসিয়া শেষ হয়, তাহা অনাদি হইতে পারে না এবং যাহা কোন স্থান হইতে আরম্ভ হয়, তাহাও অনন্ত হইতে পারে না। মানবাত্মার উৎপত্তিরূপ ভয়াবহ অসম্ভব ব্যাপার আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। জন্মান্তরবাদে আত্মার স্বাধীনতার কথা বিঘোষিত হয়। মনে করুন, ইহা সুনিশ্চিতরূপে স্বীকৃত হইল যে, আদি বলিয়া একটা জিনিষ আছে। তাহা হইলে মানুষের মধ্যে যত অপবিত্রতা আছে, তাহার দায়িত্ব ভগবানের উপর আসিয়া পড়ে। অসীম করূণাময় জগৎ-পিতা তাহা হইলে সংসারের সমুদয় পাপের জন্য দায়ী! পাপ যদি এইভাবেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে একজন অন্যের অপেক্ষা অধিক দুঃখ ভোগ করিবে কেন? যদি অসীম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট হইতেই যাহা কিছু সব আসিয়া থাকে, তবে এত পক্ষপাত কেন? কেনই বা লক্ষ লক্ষ লোক পদদলিত হয়? দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টির জন্য যাহারা দায়ী নয়, তাহারা কেন অনাহারে মরে? ইহার জন্য দায়ী কে? ইহাতে মানুষের কোন হাত না থাকিলে ভগবানকেই নিশ্চিতরূপে দায়ী করিতে হয়। সুতরাং ইহার উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা এই যে, কাহারও ভাগ্যে যে-সকল দুঃখভোগ হয়, তাহার জন্য সে-ই দায়ী। কোন চক্রকে যদি আমি গতিশীল করি, তাহার ফলের জন্য আমিই দায়ী এবং আমি যখন আমার দুঃখ উৎপন্ন করিতে পারি, তখন তাহার নিবৃত্তিও আমিই করিতে পারি। অতএব এই নিশ্চিত

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আমরা স্বাধীন। অদৃষ্ট বলিয়া কোন কিছু নাই। আমাদিগকে বাধ্য করিবার কিছুই নাই। আমরা নিজেরা যাহা করিয়াছি, আমরা তাহার নিবৃত্তিও করিতে পারি।

এই মতবাদের সম্পর্কে একটি যুক্তি আমি দিতেছি; ইহা কিছু জটিল বলিয়া আপনা-দিগকে একটু ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক শুনিতে অনুরোধ করি। অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি—ইহাই একমাত্র উপায়। যাহাকে আমরা অভিজ্ঞতা বলি, তাহা আমাদের চিত্তের জ্ঞানভূমিতে ঘটিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন—একটি লোক পিয়ানো বাজাইতেছে, সে জ্ঞাতসারে প্রত্যেক সুরের চাবির উপর তাহার প্রতিটি আঙুল রাখিতেছে। এই প্রক্রিয়াটি সে বার বার করিতে থাকে, যতক্ষণ না ঐ অঙ্গুলি-সঞ্চালন ব্যাপারটি অভ্যাসে পরিণত হয়। পরে সে প্রত্যেক চাবির দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়াও একটি সুর বাজাইতে পারে। সেইরূপে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই যে, অতীতে আমরা সজ্ঞানে যে-সব কাজ করিয়াছি, তাহারই ফলে আমাদের বর্তমান সংস্কারসমূহ রচিত হইয়াছে। প্রত্যেক শিশু কতকগুলি সংস্কার লইয়া জন্মায়। সেগুলি কোথা হইতে আসিল? জন্ম হইতে কোন শিশু একেবারে সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে না, অর্থাৎ তাহার মন লেখাজোখাহীন সাদা কাগজের মত থাকে না। পূর্ব হইতেই সে-কাগজের উপর লেখা হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীস ও মিশরের দার্শনিকগণ বলেন, কোন শিশু শূন্য মন লইয়া জন্মায় না। শিশুমাত্রই অতীতে সজ্ঞানকৃত শত শত কর্মের সংস্কার লইয়া জগতে আসে। এগুলি সে এ-জন্মে অর্জন করে নাই এবং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সেগুলি সে পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জন করিয়াছিল। ঘোরতর জড়বাদীকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এই সংস্কারসমূহ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মসমূহের ফলে উৎপন্ন হয়। তাঁহারা কেবল এইটুকু বেশী বলেন, উহা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে; আমাদের পিতা-মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহীগণ বংশানুক্রমিক নিয়মানুসারে আমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। কেবল বংশপরম্পরা স্বীকার করিলেই যদি এ-সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা হইয়া যায়, তাহা হইলে আর আত্মায় বিশ্বাস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ শরীর-অবলম্বনেই আজকাল সব ব্যাখ্যা

হইতে পারে। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন বিচার ও আলোচনার খুঁটিনাটির মধ্যে যাইবার এখন আমাদের প্রয়োজন নাই।—যাঁহারা ব্যষ্টি-আত্মায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জন্য এতদূর পর্যন্ত অর্থ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি যে, কোন যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের পূর্বজন্ম ছিল। পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত দার্শনিক ও সাধুমহাপুরুষদের ইহাই বিশ্বাস। য়াহুদীরাও এরূপ মত বিশ্বাস করিত। ভগবান্ যীশুও ইহাতে বিশ্বাসী ছিলেন। বাইবেলে তিনি বলিতেছেন, 'আব্রাহামের পূর্বেও আমি বর্তমান ছিলাম।' এবং অন্যত্র পাওয়া যায়—'ইনিই সেই ইলিয়াস, যাঁহার আগমনের কথা ছিল।'

যে বিভিন্ন ধর্মসমূহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থা ও আবেষ্টনীর মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেগুলির আদি উৎপত্তিস্থল এশিয়া মহাদেশ এবং এশিয়াবাসীরাই সেগুলি বেশ ভালরূপে বুঝিতে পারে। ঐ ধর্মসমূহ যখন উৎপত্তিস্থলের বাহিরে প্রচারিত হইল, তখন সেগুলি অনেক ভ্রান্ত মতের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িল। খ্রীষ্টান ধর্মের অতি গভীর ও উদার-ভাব ইওরোপ কখনও ধরিতে পারে নাই। কারণ বাইবেল-প্রণেতাগণের ব্যবহৃত ভাব, চিন্তাধারা ও রূপকসমূহের সহিত তাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ম্যাডোনার প্রতিকৃতিটিকে উদাহরণস্বরূপ ধরুন। প্রত্যেক শিল্পী ম্যাডোনাকে স্বীয় হৃদয়গত পূর্বধারণানুযায়ী চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যীশুখ্রীষ্টের শেষ নৈশভোজনের শত শত ছবি দেখিয়াছি; প্রত্যেকটিতে তাঁহাকে একটি টেবিলে খাইতে বসান হইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও টেবিলে খাইতে বসিতেন না। তিনি সকলের সঙ্গে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিতেন, আর একটি বাটিতে রুটি ডুবাইয়া উহা খাইতেন। আপনারা যে রুটি এখন খান, উহা তাহার মত নয়। এক জাতির পক্ষে অপর জাতির বহু শতাব্দী যাবৎ অপরিচিত প্রথা-সকল বুঝিতে পারা বড় কঠিন। গ্রীক, রোমান ও অন্যান্য জাতির দ্বারা সংসাধিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর য়াহুদী প্রথাসমূহ বুঝিতে পারা ইওরোপবাসীদের নিকট কতই না শক্ত ব্যাপার! যে-সকল অলৌকিক ব্যাপার ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা দ্বারা যীশুর ধর্ম পরিবৃত রহিয়াছে, সেগুলির মধ্য হইতে লোকে যে ঐ সুন্দর ধর্মের অতি সামান্যমাত্র ধর্ম হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিয়াছে এবং উহাকে কালে একটি দোকানদারের ধর্মে পরিণত করিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

এখন আসল কথায় আসা যাক। আমরা দেখিলাম—সকল ধর্মই আত্মার অমরত্বের কথা বলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শিক্ষা দেয় যে, আত্মার পূর্ব জ্যোতি হ্রাস পাইয়াছে এবং ঈশ্বরানুভূতি দ্বারা উহার সেই আদি বিশুদ্ধ স্বভাবের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এখন এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা কিরূপ? সর্বপ্রথমে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা অতি অস্পষ্টই ছিল। অতি প্রাচীন জাতিরা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করিত—সূর্য, পৃথিবী, অগ্নি, জল (বরুণ) ইত্যাদি। প্রাচীন য়াহুদী ধর্মে আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ অসংখ্য দেবতা নৃশংসভাবে পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন। তারপর পাই ইলোহিম দেবতাকে, যাঁহাকে য়াহুদী ও ব্যাবিলনবাসী উভয়েই পূজা করিত। পরে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন ভগবানকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা হইতেছে, কিন্তু বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধারণানুযায়ী ঈশ্বরের ধারণাও বিভিন্ন ছিল। প্রত্যেকেই তাহাদের দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করিত এবং যুদ্ধ করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের মধ্যে যে জাতি যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ হইত, সে ঐ ভাবেই নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিত। সেই-সব জাতি প্রায়শঃ অসভ্য ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ উচ্চতর ধারণাসমূহ প্রাচীন ধারণার স্থান অধিকার করিল। এখন সেই-সব পুরাতন ধারণা আর নাই, যেটুকু বা আছে, তাহা অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। পূর্বোক্ত সকল ধর্মই শত শত বর্ষের ক্রমবিকাশের ফল, কোনটিই আকাশ হইতে পড়ে নাই। প্রত্যেককে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তারপর একেশ্বরবাদের ধারণা আসিল, ঐ মতে ঈশ্বর এক এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্, তিনি বিশ্বের বাহিরে স্বর্গে বাস করেন। তিনি প্রাচীন উদ্ভাবকগণের স্থূলবুদ্ধি অনুযায়ী এইরূপেই বর্ণিত হইলেন, যথাঃ 'তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বদ্বয় আছে, তাঁহার হস্তে একটি পাখী আছে'—ইত্যাদি। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, গোষ্ঠী-দেবতারা চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের স্থানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি সর্বদেবেশ্বর। এই স্তরেও তিনি বিশ্বাতীত, তিনি দুরভিগম্য, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধারণাটিও

পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং ঠিক তার পরের স্তরে আমরা দেখিতে পাই এমন এক ঈশ্বর, যিনি সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন।

নিউ টেষ্টামেণ্টে আছে, 'হে আমাদের স্বর্গবাসী পিতা' ; এখানেও এক ভগবানের কথা, যিনি মনুষ্য হইতে দূরে স্বর্গে বাস করেন। আমরা পৃথিবীতে বাস করিতেছি এবং তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন। আরও অগ্রসর হইয়া আমরা এরূপ শিক্ষা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর চরাচর প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে আছেন। তিনি যে কেবল স্বর্গের ঈশ্বর তাহা নয়, তিনি পৃথিবীরও ঈশ্বর। তিনি আমাদের অন্তর্যামী ভগবান্। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রেরও একটি স্তরে ভগবানকে ঠিক এইভাবেই আমাদের অতি নিকটবর্তী বলা হইয়াছে। হিন্দু দর্শন এই পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়া যায় নাই; ইহার পরেও অদ্বৈতের একটি স্তর আছে। এই অবস্থায় মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে, যে ঈশ্বরকে—যে ভগবানকে সে এতদিন উপাসনা করিয়া আসিতেছে, তিনি কেবলমাত্র স্বর্গ ও পৃথিবীস্থ পিতা নন, পরন্তু 'আমি ও আমার পিতা এক'; আত্মস্থ হইয়া যে ইহা উপলব্ধি করে, সে স্বয়ং ঈশ্বর; কেবল প্রভেদ এই যে, সে তাঁহার একটি নিম্নতর প্রকাশ। আমার মধ্যে যাহা কিছু যথার্থ বস্তু, তাহাই তিনি এবং তাঁহার মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই আমি। এইরূপেই ঈশ্বর ও মানবের মধ্যবর্তী পার্থক্য দূরীভূত হয়। এই প্রকারে আমরা বুঝিতে পারিলাম, কিরূপে ঈশ্বরকে জানিলে স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হয়।

প্রথম অর্থাৎ দ্বৈতাবস্থায় মানুষ বোধ করে, সে জন, জেমস্ বা টম ইত্যাদি নামধেয় একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মা এবং সে বলে, সে অনন্তকাল ধরিয়া ঐ জন, জেমস্ ও টমই থাকিয়া যাইবে, কখনই অন্য কিছু হইবে না। কোন খুনী আসামী যদি বলে, 'আমি চিরকাল খুনীই থাকিয়া যাইব', ইহাও যেন ঠিক সেইরূপ বলা হইল। কিন্তু কালের পরিবর্তনে টম অদৃশ্য হইয়া সেই খাঁটি আদি মানব আদমেই ফিরিয়া যায়।

পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কারণ তাঁহারাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। আমরা কি ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি? অবশ্যই পারি না। আমরা কি ঈশ্বরকে জানিতে পারি? নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বর যদি জ্ঞাতই হন, তাহা হইলে তিনি আর ঈশ্বরই থাকিবেন না। জানা মানেই সীমাবদ্ধ

করা। কিন্তু 'আমি ও আমার পিতা এক।' আত্মাতেই আমি আমার বাস্তব পরিচয় পাই। কোন কোন ধর্মে এই-সকল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্মে ইহার ইঙ্গিত-মাত্র আছে। আবার কোনটিতে ইহা একেবারে বর্জিত হইয়াছে। খ্রীষ্টের ধর্ম এখন এদেশে খুব কম লোকের বোধগম্য; আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি বলিতে চাই, তাঁহার উপদেশ এদেশে কোনকালেই উত্তমরূপে বোধগম্য হয় নাই।

পবিত্রতা ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য ক্রমোন্নতির বিভিন্ন সোপানের সবগুলিই অত্যাবশ্যক। ধর্মের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি মূলে একই রূপ ধারণা বা ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। যীশু বলিতেছেনঃ 'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান', আবার বলিতেছেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।' আপনারা কিরূপে এই উপদেশ দুইটির সামঞ্জস্য করিবেন? কেবল নিম্নোক্তরূপে ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারেন। তিনি অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ লোকদের শেষোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে তাহাদের ভাষাতেই উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সাধারণ লোক চায় কতগুলি সহজবোধ্য ধারণা—এমন কিছু, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়। কেহ হয়তো জগতে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি ধর্ম-বিষয়ে তিনি হয়তো শিশুমাত্র। মানব যখন উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করে, তখন বুঝিতে পারে যে, স্বর্গরাজ্য তাঁহার অন্তরেই রহিয়াছে। তাহাই যথার্থ মনোরাজ্য—স্বর্গরাজ্য। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক ধর্মে যে-সকল আপাতবিরোধ ও জটিলতা প্রতীত হয়, তাহা শুধু তাহার ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরের সূচনা করে। সেই হেতু ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কাহাকেও নিন্দা করিবার অধিকার আমাদের নাই। ধর্মের ক্রমবিকাশের পথে এমন সব স্তর আছে, যাহাতে মূর্তি ও প্রতীক আবশ্যক হইয়া থাকে। জীব ঐ অবস্থায় ঐরূপ ভাষা বুঝিতেই সমর্থ।

আর একটি কথা আপনাদিগকে জানাইতে চাই—ধর্ম-অর্থে কোন মন-গড়া মত বা সিদ্ধান্ত নয়। আপনারা কি অধ্যয়ন করেন অথবা কি মতবাদ বিশ্বাস করেন, তাহাই প্রধান বিচার্য বিষয় নয়, বরং আপনি কি উপলব্ধি করেন, তাহাই জ্ঞাতব্য। 'পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কারণ তাঁহাদের ঈশ্বর-দর্শন হইবে।'—ঠিক কথা, এই জীবনেই দর্শন হইবে; আর ইহাই তো

মুক্তি। এমন সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে শাস্ত্রবাক্য জপ করিলেই মুক্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন মহাপুরুষ এরূপ শিক্ষা দেন নাই যে, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলি মুক্তিলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মুক্ত হওয়ার শক্তি আমাদের মধ্যেই আছে। আমরা ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মেরই মধ্যে আমাদের সব ক্রিয়াদি চলিতেছে।৯

মতবাদ ও সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে-সব শিশুদের জন্য। উহাদের প্রয়োজন সাময়িক। শাস্ত্র কখনও আধ্যাত্মিকতার জন্ম দেন নাই, বরং আধ্যাত্মিকতাই শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে—এ-কথা যেন আমরা না ভুলি। এ-পর্যন্ত কোন ধর্মপুস্তক ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিতে পারে নাই, কিন্তু ঈশ্বরই সকল উচ্চতম শাস্ত্রের উদ্দীপক। আর এ-পর্যন্ত কোন ধর্মপুস্তক আত্মাকে সৃষ্টি করে নাই—এ-কথাও যেন ভুলিয়া না যাই। সকল ধর্মের শেষ লক্ষ্য—আত্মাতেই ঈশ্বর দর্শন করা। ইহাই একমাত্র সর্বজনীন ধর্ম। ধর্মমতসমূহের মধ্যে সর্বজনীন বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে এই ঈশ্বরানুভূতিকে আমি এখানে উহার স্থলাভিষিক্ত করিতে চাই। আদর্শ ও রীতিনীতি ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই ঈশ্বরানুভূতিই কেন্দ্র-বিন্দুস্বরূপ। সহস্র ব্যাসার্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু উহারা এক কেন্দ্রে মিলিত হয় এবং উহাই ঈশ্বরদর্শন; ইহা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতীত বস্তু—ইহা চিরকাল পান, ভোজন, বৃথা বাক্যব্যয় এবং এই ছায়াবৎ মিথ্যা ও স্বার্থপূর্ণ জগতের বাহিরে। এই সমুদয় গ্রন্থ, ধর্মবিশ্বাস ও জগতের সকল প্রকারের অসার আড়ম্বরের ঊর্ধ্বে ঐ এক বস্তু রহিয়াছে, আর উহাই হইল তোমার অন্তরে ঈশ্বরানুভূতি। একজন লোক পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদে বিশ্বাসী হইতে পারে, এ-পর্যন্ত যত প্রকার ধর্মপুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তাহা সব স্মরণ রাখিতে পারে, এবং পৃথিবীতে সকল নদীর পূতবারিতে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহার ঈশ্বরানুভূতি না হয়, তবে তাহাকে আমি ঘোর নাস্তিক বলিয়াই গণ্য করিব। অপর একজন যদি কখনও কোন গীর্জা বা মসজিদে প্রবেশ না করিয়া থাকেন, কোন ধর্মানুষ্ঠান না করিয়া থাকেন, অথচ অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা এই জগতের অসার আড়ম্বরের ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া থাকেন, তবে তিনিই মহাত্মা, তিনিই সাধু—বা যে-কোন নামে ইচ্ছা তাঁহাকে অভিহিত করিতে পার। যখন দেখিবে—কেহ বলিতেছে, 'কেবলমাত্র আমিই ঠিক, আমার

সম্প্রদায়ই যথার্থ পথ ধরিয়াছে এবং অপর সকলে ভুল করিতেছে’, তখন জানিবে তাহারই সব ভুল। সে জানে না যে, অপর মতসমূহের প্রামাণ্যের উপর তাহার মতের সত্যতা নির্ভর করিতেছে। সমুদয় মানবজাতির প্রতি প্রেম ও সেবাই ঠিক ঠিক ধার্মিকতার প্রমাণ। লোকে ভাবের উচ্ছ্বাসে যে বলিয়া থাকে, ‘সকল মানুষই আমার ভাই’, আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি না; কিন্তু ইহাই বলিতে চাই যে, সমস্ত মানবজীবনের একত্বানুভূতি হওয়া আবশ্যক। সকল সম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাসই ততক্ষণ অতি সুন্দর, এবং আমি সেগুলিকে আমার বলিতে স্বীকার করিতে রাজী আছি, যতক্ষণ তাহারা অপরকে অস্বীকার না করে, যতক্ষণ তাহারা সকল মানবসমাজকে যথার্থ ধর্মের দিকেই পরিচালিত করিতেছে। আমি আরও বলিতে চাই যে, কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু উহারই গণ্ডীর মধ্যে মরা ভাল নয়। শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করা ভাল বটে, কিন্তু আমরণ শিশু থাকিয়া যাওয়া ভাল নয়। ধর্মসম্প্রদায়, আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীকাদি শিশুদের জন্য ভাল, কিন্তু শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহাকে হয় ঐ গণ্ডিসমূহের বা নিজের শিশুত্বের সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। চিরকাল শিশু থাকা আমাদের কোনক্রমেই ভাল নয়। ইহা যেন বিভিন্ন বয়সের ও আকারের শরীরে একটি মাপের জামা পরাইবার চেষ্টার মত। আমি জগতে সম্প্রদায় থাকার নিন্দা করিতেছি না। ঈশ্বর করুন—আরও দুই-কোটি সম্প্রদায় হউক, তাহা হইলে পছন্দমত আপন আপন উপযোগী ধর্মমত নির্বাচনের অধিক সুবিধা থাকিবে। কিন্তু একটি-মাত্র ধর্মকে যখন কেহ সকলের পক্ষে খাটাইতে চায়, তখনই আমার আপত্তি। যদিও সকল ধর্ম পরমার্থতঃ এক, তথাপি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন অবস্থায় সঞ্জাত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান থাকিবেই। আমাদের প্রত্যেকেরই একটি ব্যক্তিগত ধর্ম, অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশের দৃষ্টিতে একটি নিজস্ব ধর্ম থাকা আবশ্যক।

বহু বৎসর পূর্বে আমি আমার জন্মভূমিতে অতীব শুদ্ধস্বভাব এক সাধু মহাত্মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমরা আমাদের স্বয়ম্ভু বেদ, আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরান এবং সকল প্রকার স্বপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। আমাদের আলোচনার শেষে সেই সাধুটি আমাকে টেবিল হইতে একখানি পুস্তক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। এই পুস্তকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেই বৎসরের বর্ষণ-ফলাফলের উল্লেখ ছিল। সাধুটি

আমাকে উহা পাঠ করিতে বলিলেন এবং আমি উহা হইতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণটি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তখন তিনি বলিলেন—'এখন তুমি পুস্তকটি একবার নিঙড়াইয়া দেখ তো!' তাঁহার কথামত আমি ঐরূপ করিলাম। তিনি বলিলেন—'কই বৎস! একফোঁটা জলও যে পড়িতেছে না! যতক্ষণ পর্যন্ত না জল বাহির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা পুস্তকমাত্র; সেইরূপ যতদিন পর্যন্ত তোমার ধর্ম তোমাকে ঈশ্বর উপলব্ধি না করায়, ততদিন উহা বৃথা। যিনি ধর্মের জন্য কেবল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার অবস্থা ঠিক যেন একটি গর্দভের মত, যাহার পিঠে চিনির বোঝা আছে, কিন্তু সে উহার মিষ্টত্বের কোন খবর রাখে না।'

মানুষকে কি এই উপদেশ দেওয়া উচিত যে, সে হাঁটু গাড়িয়া কাঁদিতে বসুক আর বলুক, 'আমি অতি হতভাগ্য ও পাপী?' না, তাহা না করিয়া বরং তাহার দেবত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। আমি একটি গল্প বলিতেছি। শিকার-অন্বেষণে আসিয়া এক সিংহী একপাল মেষ আক্রমণ করিল। শিকার ধরিবার জন্য লাফ দিতে গিয়া সে একটি শাবক প্রসব করিয়া সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সিংহশাবকটি মেষপালের সহিত বর্ধিত হইতে লাগিল। সে ঘাস খাইত এবং মেষের মত ডাকিত। সে মোটেই জানিত না যে, সে সিংহ। একদিন এক সিংহ সবিস্ময়ে দেখিল যে, মেষপালের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সিংহ ঘাস খাইতেছে এবং মেষের মত ডাকিতেছে। ঐ সিংহকে দেখিয়া মেষের পাল এবং সেই সঙ্গে ঐ সিংহটিও পলায়ন করিল। কিন্তু সিংহটি সুযোগ খুঁজিতে লাগিল, এবং একদিন মেষ-সিংহটিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহাকে জাগাইয়া বলিল—'তুমি সিংহ।' সে বলিল, 'না', এই বলিয়া মেষের মত ডাকিতে লাগিল। কিন্তু আগন্তুক সিংহটি তাহাকে একটি হ্রদের ধারে লইয়া গিয়া জলের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বলিল, 'দেখ তো, তোমার আকৃতি আমার মত কিনা!' সে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া স্বীকার করিল যে, তাহার আকৃতি সিংহের মত। তারপর সিংহটি গর্জন করিয়া দেখাইল এবং তাহাকেও সেইরূপ করিতে বলিল। মেষ-সিংহটিও সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং শীঘ্রই তাহার মত গম্ভীর গর্জন করিতে পারিল। এখন সে আর মেষ নয়, সিংহ। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সকলকে বলিতে চাই যে, আপনারা সকলে সিংহের মত পরাক্রমশালী। যদি আপনাদের গৃহ অন্ধকারাবৃত থাকে, তাহা হইলে কি আপনারা বুক চাপড়াইয়া

‘অন্ধকার অন্ধকার’ বলিয়া কাঁদিতে থাকিবেন? তাহা নয়। আলো পাইবার একমাত্র উপায় আলো জ্বালা, তবেই অন্ধকার চলিয়া যাইবে। ঊর্ধ্বের আলো পাইবার একমাত্র উপায় অন্তরের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলো জ্বালা। তবেই পাপ ও অপবিত্রতারূপ অন্ধকার দূরীভূত হইবে। তোমরা উচ্চ প্রকৃতির বিষয় চিন্তা কর; হীনতার কথা ভাবিও না।

৭. বৈদিক ধর্মাদর্শ

আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ধর্মবিষয়ক চিন্তা—আত্মা, ঈশ্বর এবং ধর্ম-সম্পর্কীয় যা কিছু কথা। আমরা বেদের সংহিতার কথা বলিব। সংহিতা-অর্থে স্তোত্র-সংগ্রহ—এগুলিই প্রাচীনতম আর্য-সাহিত্য; যথাযথভাবে বলিতে গেলে এগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিতে হইবে। এগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর সাহিত্যের নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে ঠিকঠিক গ্রন্থ বা সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে না। সংগৃহীত গ্রন্থ-হিসাবে পৃথিবীতে এগুলি প্রাচীনতম এবং এগুলিতেই আর্যজাতির সর্বপ্রথম মনোভাব, আকাঙ্ক্ষা, রীতি-নীতি সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন উঠিয়াছে, সে-সব চিত্রিত আছে। একেবারে প্রথমেই আমরা একটি অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাই। এই স্তোত্রসমূহ বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে রচিত স্তুতিগান। দ্যুতিসম্পন্ন, তাই 'দেবতা'। তাঁহারা সংখ্যায় অনেক—ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, পর্জন্য ইত্যাদি। আমরা একটির পর একটি বহুবিধ পৌরাণিক ও রূপক মূর্তি দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বজ্রধর ইন্দ্র—মানুষের নিকট বারিবর্ষণে বিঘ্ন-উৎপাদনকারী সর্পকে আঘাত করিতেছেন। তারপর তিনি বজ্র-নিক্ষেপ করিলে সর্প নিহত হইল, অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মানুষেরা ইন্দ্রকে যজ্ঞাহুতি দ্বারা আরাধনা করিতেছে। তাহারা যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিয়া সেখানে পশু বধ করিতেছে, শলাকার উপরে উহা পক্ব করিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করিতেছে। তাহাদের একটি সর্বজনপ্রিয় 'সোমলতা' নামক ওষধি ছিল; উহা যে ঠিক কি, তাহা এখন আর কেহই জানে না, উহা একেবারে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি, উহা নিষ্পেষণ করিলে দুগ্ধবৎ এক প্রকার রস বাহির হইত, রস গাঁজিয়া উঠিত; আরও জানা যায়, এই সোমরস মাদক দ্রব্য। ইহাও সেই আর্যেরা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণের উদ্দেশে নিবেদন করিতেন এবং নিজেরাও পান করিতেন। কখনও কখনও তাঁহারা এবং দেবগণ একটু বেশী মাত্রাতেই পান করিতেন। ইন্দ্র কখনও কখনও সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়া পড়িতেন। ঐ গ্রন্থে এরূপও লেখা আছে এক সময়ে ইন্দ্র এত অধিক সোমরস পান করিয়াছিলেন যে, তিনি অসংলগ্ন কথা বলিতে লাগিলেন। বরুণদেবতারও একই গতি। তিনি আর

একজন অতিশয় শক্তিশালী দেবতা এবং ইন্দ্রের মত তাঁহার উপাসকগণকে রক্ষা করেন; উপাসকগণও সোম আহুতি দিয়া তাঁহার স্তুতি করেন। রণদেবতা (মরুৎ) ও অপর দেবগণের ব্যাপারও এইরূপ। কিন্তু অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই-সব দেবতার প্রত্যেকের চরিত্রে অনন্তের (অনন্ত শক্তির) ভাব রহিয়াছে। এই অনন্ত কখনও কখনও ভাবরূপে চিত্রিত, কখনও আদিত্যরূপে বর্ণিত, কখনও বা অন্যান্য দেবতাদের চরিত্রে আরোপিত। ইন্দ্রেরই কথা ধর। বেদের কোন কোন অংশে দেখিতে পাইবে, ইন্দ্র মানুষের মত শরীরধারী, অতীব শক্তিশালী, কখনও স্বর্ণ-নির্মিত-বর্মপরিহিত, কখনও বা উপাসকগণের নিকট অবতরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত আহার ও বসবাস করিতেছেন, অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, সর্পকুলের ধ্বংস করিতেছেন ইত্যাদি। আবার একটি স্তোত্রে দেখিতে পাই, ইন্দ্রকে উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে; তিনি সর্বশক্তিমান্, সর্বত্র বিদ্যমান এবং সর্বজীবের অন্তর্দ্রষ্টা। বরুণদেবতার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে—ইনিও ইন্দ্রের মত অন্তরীক্ষের দেবতা ও বৃষ্টির অধিপতি। তারপর সহসা দেখিতে পাই, তিনি উচ্চাসনে উন্নীত; তাঁহাকে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বলা হইতেছে। আমি তোমাদের নিকট বরুণদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে একটি স্তোত্র পাঠ করিব, তাহাতে তোমরা বুঝিতে পারিবে আমি কি বলিতেছি। ইংরেজীতেও কবিতাকারে ইহা অনূদিত হইয়াছে।

আমাদের কার্যচয় উচ্চ হ’তে দেখিবারে পান,
যেন অতি নিকটেই প্রভুদেব সর্বশক্তিমান্।
যদিও মানুষ রাখে কর্মচয় অতীব গোপন,
স্বর্গ হ’তে দেবগণ হেরিছেন সব অনুক্ষণ।
যে-কেহ দাঁড়ায়, নড়ে, গোপনেতে যায় স্থানান্তর,
সুনিভৃত কক্ষে পশে, দেবতার দৃষ্টি তার’ পর।
উভয়ে মিলিয়া যেথা ষড়্‌যন্ত্র করে ভাবি মনে,
কেহ না হেরিছে দোঁহে, মিলিয়াছে অতি সঙ্গোপনে।
তৃতীয় বরুণদেব সেই স্থানে করি অবস্থান,

দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাত হন সর্বশক্তিমান্।
এই যে রয়েছে বিশ্ব–অধিপতি তিনি গো ইহার,
ওই যে হেরিছ নভঃ সুবিশাল সীমাহীন তাঁর।
রাজিছে তাঁহারই মাঝে অন্তহীন দুটি পারাবার,
তবু ক্ষুদ্র জলাশয় রচেছেন আগার তাঁহার।
বাঞ্ছা যার আছে মনে উঠিবারে উচ্চ গগনেতে,
বরুণের হস্তে তার অব্যাহতি নাই কোনমতে।
নভঃ হ'তে অবতরি চরগণ তাঁর নিরন্তর,
করিছে ভ্রমণ অতিদ্রুত সারা পৃথিবীর ' পর।
দূর দূরতম স্থানে লক্ষ্য তারা করিছে সতত,
পরীক্ষাকুশল নেত্র বিস্ফারিত করি শত শত।১০

অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। তাঁহারা একের পর এক সেই একই অবস্থা লাভ করেন। প্রথমে তাঁহারা অন্যতম দেবতারূপে আরাধিত হন, কিন্তু তারপর সেই পরমসত্তারূপে গৃহীত হন, যাঁহাতে সমগ্র জগৎ অবস্থিত, যিনি প্রত্যেকের অন্তর্যামী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা। বরুণদেব সম্বন্ধে কিন্তু আর একটি ধারণা আছে। উহার অঙ্কুর মাত্র দেখা গিয়াছিল, কিন্তু আর্যগণ শীঘ্রই উহা দমন করিয়াছিলেন–উহা 'ভীতির ধারণা'। অন্য একস্থলে দেখা যায়–তাঁহারা ভীত, তাঁহারা পাপ করিয়া বরুণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সেই ধারণাগুলি ভারতভূমিতে বাড়িতে দেওয়া হয় নাই, ইহার কারণ পরে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু উহার বীজগুলি নষ্ট হয় নাই, অঙ্কুরিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল–'উহা ভয় ও পাপের ধারণা।' তোমরা সকলেই জান যে, এই ধারণা 'একেশ্বরবাদ' নামে উল্লিখিত মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। এই একেশ্বরবাদ একেবারে প্রথম দিকে ভারতে দেখা দিয়াছিল, দেখিতে পাই সংহিতার সর্বত্রই–উহার প্রথম ও সর্বপ্রাচীন অংশে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব, আর্যগণের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত হয় নাই, এবং হিন্দুদের বিশ্বাস, আর্যগণ উহাকে অতি প্রাথমিক ধারণাবোধে একপাশে ঠেলিয়া দেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিতে থাকেন।

অবশ্য বেদ সম্বন্ধে ইওরোপীয়দের সমালোচনা পাঠ করিয়া হিন্দুগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না। যাঁহারা (পাশ্চাত্য জাতিরা) মাতৃদুগ্ধপানের মত সগুণ-ঈশ্বরবাদকেই ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ধারণা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যখন দেখিতে পান, যে-একেশ্বরবাদের ভাবে বেদের সংহিতাভাব পূর্ণ, সেই একেশ্বরবাদকে আর্যগণ অপ্রয়োজনীয় এবং দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে এবং অধিকতর দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ ও অতীন্দ্রিয় ভাব আয়ত্ত করিতে কঠোর আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তখন স্বভাবতই তাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকগণের ভাব অনুযায়ী চিন্তা করিতে সাহস করেন না।

যদিও ঈশ্বরের বর্ণনাকালে আর্যগণ বলিয়াছেন, 'সমুদয় জগৎ তাঁহাতেই আশ্রিত' এবং 'তুমি সকল হৃদয়ের পালনকর্তা', তথাপি একেশ্বরবাদ তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত মানবভাবাপন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। হিন্দুরা সর্ববিধ চিন্তাধারায় সাহসী—এত সাহসী যে, তাঁহাদের চিন্তায় এক-একটি স্ফুলিঙ্গ পাশ্চাত্যের তথাকথিত সাহসী মনীষীদের ভীতি উৎপাদন করে। হিন্দুদের পক্ষে ইহা একটি গৌরব ও কৃতিত্বের কথা। এই হিন্দু মনীষিগণের সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যথার্থই বলিয়াছেন, 'তাঁহারা এত উচ্চে উঠিয়াছেন যে, সেখানে তাঁহাদেরই ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে; অপর দার্শনিকগণের ফুসফুস সেখানে ফাটিয়া যাইত।' এই সাহসী জাতি বরাবর যুক্তি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন; যুক্তি তাঁহাদের কোথায় লইয়া যাইবে, ইহার জন্য কি মূল্য দিতে হইবে, সে-কথা আর্য দার্শনিকগণ ভাবেন নাই; ইহার ফলে তাঁহাদের অতি প্রিয় কুসংস্কারগুলি চূর্ণ হইয়া যাইতে, অথবা সমাজ তাঁহাদের সম্বন্ধে কি ভাবিবে বা বলিবে, সে-বিষয়ে তাঁহারা দিক্‌পাত করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা যাহা সত্য ও যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন।

প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা প্রথমতঃ দু-একটি অতি আশ্চর্য বৈদিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এই-সকল দেবতা একের পর এক গৃহীত হইয়া সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অবশেষে তাঁহারা প্রত্যেকে অনাদি অখণ্ড সগুণ

ঈশ্বররূপ ধারণ করিয়াছেন; এই অভিনব ব্যাপারটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এইরূপ উপাসনাতে হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব দেখিয়া উহাকে Henotheism বা 'দেবাধিদেব' আখ্যা দিয়াছেন। উহার ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগকে বহুদূরে যাইতে হইবে না, উহা ঋগ্বেদের মধ্যেই আছে। ঐ গ্রন্থের যে-স্থলে প্রত্যেক দেবতাকে ঐরূপ সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্ডিত করিয়া উপাসনা করিবার কথা আছে, যে-স্থল হইতে আর একটু অগ্রসর হইলে আমরা তাহার অর্থও জানিতে পারি। এখন প্রশ্ন আসে—হিন্দুপুরাণসমূহ অন্যান্য ধর্মের পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি হইতে এত পৃথক্, এত বিশিষ্ট কিরূপে হইল? ব্যাবিলনীয় বা গ্রীক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতা বিশেষকে উন্নীত করিবার প্রয়াস করা হইতেছে—পরে তিনি উচ্চাসন লাভ করিয়া সেখানে চির প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্য দেবতারা হতশ্রী হইলেন। সকল মোলোকের (Molochs) মধ্যে যিহোবা (Jehovah) শ্রেষ্ঠ হইলেন, অন্যান্য মোলোকগণ চিরতরে বিস্মৃত ও বিলীন হইলেন। তিনিই দেবাধিদেব 'ঈশ্বর' হইলেন। গ্রীক দেবতাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে—জিউস (Zeus) অগ্রবর্তী হইলেন, উচ্চ উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইলেন, সমগ্র জগতের প্রভু হইলেন এবং অন্যান্য দেবগণ অতি ক্ষুদ্র দেবদূতরূপে পরিণত হইলেন। পরবর্তী কালেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। বৌদ্ধ ও জৈনগণ তাঁহাদের একজন ধর্মপ্রচারককে ঈশ্বররূপে আরাধনা করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণকে তাঁহার অধীন করিয়া দিলেন। ইহাই সর্বত্র অনুসৃত পদ্ধতি, কিন্তু এ-বিষয়ে হিন্দুধর্মে বিশেষত্ব ও ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। প্রথম একজন দেবতা বন্দিত হইতেছেন, কিছুক্ষণের জন্য অন্যান্য দেবতারা তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী বলা হইয়াছে।

আবার দেখা যায়, যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইল যে, তিনি বরুণদেবের কৃপায় উচ্চাসন পাইয়াছেন, তিনিই পরবর্তী গ্রন্থে সর্বোচ্চ গৌরব লাভ করিলেন। এই দেবগণ যথাক্রমে প্রত্যেকেই সগুণ ঈশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা ঐ পুস্তকেই আছে এবং ইহাই চমৎকার ব্যাখ্যা। যে মন্ত্রপ্রভাবে অতীত ভারতে একটি চিন্তাপ্রবাহ উঠিয়াছিল এবং যাহা ভবিষ্যতে সমগ্র ধর্মজগতে চিন্তার কেন্দ্রস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইবে, সেই মন্ত্রটি এইঃ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—যাহা সত্য তাহা এক, জ্ঞানিগণ তাহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত

করিয়াছেন। এই দেবতাদের বিষয়ে যেখানে যত স্তোত্র রচিত হইয়াছে, সর্বত্রই অনুভূত সত্তা এক—অনুভবকর্তার জন্যই যা কিছু বিভিন্নতা। স্তোত্র-রচয়িতা ঋষি ও কবিগণ বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন বাক্যে সেই একই সত্তার (ব্রহ্মের) স্তুতিগান করিয়াছেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' এই একটি মাত্র শ্রুতিবাক্য হইতে প্রভূত ফল ফলিয়াছে। সম্ভবতঃ তোমাদের কেহ কেহ ভাবিয়া বিস্মিত হইবে যে, ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখানে ধর্মের জন্য কখনই কাহারও উপর নির্যাতন হয় নাই, যেখানে কোন ব্যক্তি কখনও তাহার ধর্মবিশ্বাসের জন্য উত্যক্ত হয় নাই; সেখানে আস্তিক, নাস্তিক, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী এবং একেশ্বরবাদী সকলেই আছেন এবং কখনও নির্যাতিত না হইয়া বসবাস করিতেছেন। সেখানে জড়বাদীদিগকেও ব্রাহ্মণ-পরিচালিত মন্দিরের সোপান হইতে দেবতাদের বিরুদ্ধে, এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে দেওয়া হইয়াছে। জড়বাদী চার্বাকগণ দেশময় প্রচার করিয়াছে ঈশ্বর বিশ্বাস কুসংস্কার; এবং দেবতা, বেদ ও ধর্ম—পুরোহিতগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্ভাবিত কুসংস্কার মাত্র। তাহারা বিনা উৎপীড়নে এই-সব প্রচার করিয়াছে। এইরূপে বুদ্ধদেব হিন্দুগণের প্রত্যেক প্রাচীন ও পবিত্র বিষয় ধূলিসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াও অতি বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। জৈনগণও এইরূপ করিয়াছেন—তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব শুনিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহারা বলিতেনঃ ঈশ্বর আছেন—ইহা কিরূপে সম্ভব? ইহা শুধু একটি কুসংস্কার। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমান আক্রমণ-তরঙ্গ ভারতে আসিবার পূর্বে এদেশে ধর্মের জন্য নির্যাতন কী, তাহা কেহ কখনও জানিত না। যখন বিদেশীরা এই নির্যাতন হিন্দুদের উপর আরম্ভ করিল, তখনই হিন্দুদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হইল; এবং এখনও ইহা একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের গীর্জা-নির্মাণে কত অধিক পরিমাণে এবং তৎপরতার সহিত সাহায্য করিয়াছে—কোথাও রক্তপাত হয় নাই। এমন কি ভারতবর্ষ হইতে যে-সকল হিন্দুধর্মবিরোধী ধর্ম উত্থিত হইয়াছিল, সেগুলিও কখনও নির্যাতিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের কথা ধর—বৌদ্ধধর্ম কোন কোন বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম; কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে বেদান্ত বলিয়া মনে করা অর্থহীন। খ্রীষ্টধর্ম ও 'স্যালভেশন আর্মি'র প্রভেদ সকলেই অনুভব করিতে পারেন। বৌদ্ধধর্মে মহান্‌ ও সুন্দর ভাব আছে, কিন্তু উহা এমন

এক প্রকার মণ্ডলীর হস্তে পতিত হইয়াছিল, যাহারা ঐ ভাবসমূহ রক্ষা করিতে পারে নাই। দার্শনিকগণের হস্তের রত্নসমূহ জনসাধারণের হস্তে পড়িল এবং তাহারা দার্শনিক ভাবগুলি দখল করিয়া বসিল। তাহাদের ছিল অত্যধিক উৎসাহ, আর কয়েকটি আশ্চর্য আদর্শ, মহৎ জনহিতকর ভাবও ছিল; কিন্তু সর্বোপরি সর্ববিষয় নিরাপদ রাখিবার পক্ষে আরও কিছু প্রয়োজন—চিন্তা ও মনীষা। যেখানেই দেখিবে, উচ্চতম লোকহিতকর ভাবসমূহ শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়াছে, তাহার প্রথম ফল—অবনতি। কেবলমাত্র বিদ্যানুশীলন ও বিচারশক্তি সকল বস্তুকে সুরক্ষিত করে। তারপর এই বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তৎকালীন সমুদয় সভ্য জগতের সর্বত্র ইহা প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য একটি বিন্দু রক্তপাত হয় নাই। আমরা পড়িয়াছি, কিরূপে চীনদেশে বৌদ্ধ প্রচারকগণ নির্যাতিত হন, এবং সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ক্রমান্বয়ে দুই তিন জন সম্রাট্ কর্তৃক নিহত হন, কিন্তু তারপর যখন বৌদ্ধদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল এবং একজন সম্রাট্ উৎপীড়নকারীদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন, তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। আমাদের এই সমুদয় তিতিক্ষার জন্য ঐ এক মন্ত্রের নিকটেই আমরা ঋণী। সেইজন্যই আমি উহা তোমাদিগকে স্মরণ করিতে বলিতেছি। যাঁহাকে সকলে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ বলে—সেই সত্তা একই; ঋষিরা তাঁহাকে বহু নামে ডাকেন—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' ১১

এই স্তুতি কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা কেহই জানেন না; আট হাজার বৎসর পূর্বেও হইতে পারে এবং আধুনিক সকল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহার প্রণয়নকাল ৯০০০ বৎসর প্রাচীনও হইতে পারে।

ধর্মবিষয়ক এই অনুধ্যানগুলির একটিও আধুনিক কালের নয়, তথাপি রচনাকালে এগুলি যেমন জীবন্ত ছিল, এখনও সেইরূপ; এখন বরং অধিকতর সজীব হইয়া উঠিয়াছে, কারণ প্রাচীনতম কালে মানবজাতি আধুনিক কালের মত এত 'সভ্য' ছিল না; এতটুকু মতের পার্থক্যের জন্য সে তখনও তাহার ভ্রাতার গলা কাটিতে শিখে নাই বা রক্তস্রোতে ধরাতল

প্লাবিত করে নাই অথবা নিজ প্রতিবেশীর প্রতি পিশাচের মত ব্যবহার করে নাই। তখন মানুষ মনুষ্যত্বের নামে সমুদয় মানবজাতির ধ্বংস সাধন করিতে শিখে নাই।

সেইজন্যই 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এই মহাবাণী আজও আমাদের নিকট অতিশয় সজীব, ততোধিক মহান্, শক্তি ও জীবন-প্রদ এবং যে-কালে এগুলি লিখিত হইয়াছিল, সে-সময় অপেক্ষা অধিকতর নবীনরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এখনও আমাদের শিখিতে হইবে যে, সকল প্রকার ধর্ম—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান—যে-কোন নামেই অভিহিত হউক না, সকলে একই ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং যে এগুলির একটিকে ঘৃণা করে, সে তাহার নিজের ভগবানকেই ঘৃণা করে।

তাঁহারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন। কিন্তু পূর্বে যেমন বলিয়াছি—এই প্রাচীন একেশ্বরবাদ হিন্দু চিত্তকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই; কারণ আধ্যাত্মিক রাজ্যে ইহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ; ইহার দ্বারা দৃশ্য জগতের ব্যাখ্যা হয় না—পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসনকর্তা দ্বারা পৃথিবীর ব্যাখ্যা হয় না।

বিশ্বের একজন নিয়ন্তা দ্বারা কখনই বিশ্বের ব্যাখ্যা হয় না, বিশেষতঃ বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত নিয়ন্তার দ্বারা ইহার সম্ভাবনা তো আরও কম। তিনি আমাদের নৈতিক গুরু হইতে পারেন—জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু তাহা তো বিশ্বের ব্যাখ্যা নয়।

তাই প্রথম প্রশ্ন উঠিতেছে—বিরাট প্রশ্ন উঠিতেছে!

'এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া আসিল এবং কিরূপেই বা অবস্থান করিতেছে?'১২ এই প্রশ্ন-সমাধানের একটি বিশিষ্ট রূপ গঠনের জন্য বহু স্তোত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই স্তোত্রে যেরূপ অপূর্ব কাব্যের সহিত উহা প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় নাঃ

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।

কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥১৩

যখন অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, যখন অন্তরীক্ষ ছিল না, যখন কিছুই ছিল না, কোন্ বস্তু সকলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, কিসে সব বিশ্রাম করিতেছিল? তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না। অনুবাদে মূলের কাব্যমাধুরী বহুলাংশে নষ্ট হইয়া যায়–' তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না!' সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেক ধ্বনিটি যেন সুরময়! তখন সেই 'এক (ঈশ্বর) অবরুদ্ধ-প্রাণে নিজেতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না'–এই ভাবটি উত্তমরূপে ধারণা করা উচিত যে, ঈশ্বর অবরুদ্ধ-প্রাণ (গতিহীন)-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন; কারণ অতঃপর আমরা দেখিব, কিভাবে পরবর্তী কালে এই ভাব হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব অঙ্কুরিত হইয়াছে। হিন্দু দার্শনিকগণ সমগ্র বিশ্বকে একটি স্পন্দনসমষ্টি–একপ্রকার গতি মনে করিতেন, সর্বত্রই শক্তি-প্রবাহ। এই গতি সমষ্টি একটা সময়ে স্থির হইতে থাকে এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন করে এবং কিছুকালের জন্য সেই অবস্থায় স্থিতি করে। এই স্তোত্রে ঐ অবস্থার কথাই বর্ণিত হইয়াছে–এই জগৎ স্পন্দনহীন হইয়া নিশ্চল অবস্থায় ছিল। যখন এই সৃষ্টির সূচনা হইল, তখন উহা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল এবং উহা হইতে জগৎ বাহির হইয়া আসিল। সেই পুরুষের নিঃশ্বাস–শান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ–ইহার বাহিরে আর কিছু নাই।

প্রথম একমাত্র অন্ধকারই ছিল। তোমাদের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষে অথবা অন্য কোন গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশে গিয়া মৌসুমী-বায়ু-চালিত মেঘ-বিস্তার দেখিয়াছ, তাহারাই এই বাক্যের গাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবে। আমাদের মনে আছে, তিনজন কবি এই দৃশ্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মিল্টন বলিয়াছেন, 'সেখানে আলোক নাই, বরং অন্ধকার দৃশ্যমান।' কালিদাস বলেন, 'সূচিভেদ্য অন্ধকার।' কিন্তু কেহই এই বৈদিক বর্ণনার নিকটবর্তী হইতে পারেন নাই–'অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুকান ছিল।' সর্ববস্তু দহ্যমান,

মর্মরিত—শুষ্ক, সমগ্র সৃষ্টি যেন ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে, এবং এইভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর একদিন সায়াহ্নে দিক্‌চক্রবালের একপ্রান্তে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল, এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেঘে পৃথিবী ছাইয়া গেল, মেঘের উপর মেঘ, থরে থরে মেঘ—তারপর প্রবল ধারায় উহা যেন ফাটিয়া পড়িল, প্লাবন শুরু হইল।

এখানে সৃষ্টির কারণরূপে ইচ্ছাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা ছিল, তাহা যেন ইচ্ছারূপে পরিণত হইল এবং ক্রমে তাহা হইতেই বাসনার প্রকাশ। এইটি আমাদের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত, কারণ এই বাসনাই আমাদের যাহা কিছু প্রত্যক্ষের কারণরূপে কথিত হইয়াছে। এই ইচ্ছার ধারণাই বৌদ্ধ ও বেদান্ত চিন্তাপদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ এবং পরবর্তীকালে জার্মান দর্শনে প্রবিষ্ট হইয়া শোপেনহাওয়ারের দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে। এইখানেই আমরা প্রথম পাইঃ

ব্যক্ত মনেতে উপ্ত সে বীজ—সে কোন্ প্রভাতে দূর জাগিয়া উঠিল ইচ্ছা প্রথম—বাসনার অঙ্কুর!
কবি-কল্পনা জ্ঞানের সহায়ে খুঁজিল হৃদয়-মাঝে,
দেখিল সেথায় সৎ ও অসৎ—বাঁধনে জড়ায়ে রাজে।১৪

ইহা এক নূতন প্রকারের অভিব্যক্তি; কবি এই বলিয়া শেষ করিলেন, ‘তিনিও বোধ হয় জানেন না, সেই অধ্যক্ষও সৃষ্টির কারণ জানেন না।’১৫ আমরা এই সূক্তে দেখিতে পাই—ইহার কাব্যমাধুরী ছাড়া বিশ্বরচনা সম্বন্ধে প্রশ্নটি এক নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। এবং এই-সব ঋষিদের মন এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাঁহারা আর সাধারণ উত্তরে সন্তুষ্ট নন। আমরা এখানে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা ‘পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত এই জগতের অধ্যক্ষ একজন শাসনকর্তায়’ সন্তুষ্ট নন। এই বিশ্ব কিরূপে আবির্ভূত হইল—এই বিষয়টি আরও অনেক সূক্তে আছে এবং আমরা পূর্বে যেমন দেখিয়াছি যে, তাঁহারা একজন ব্যক্তিবিশেষকে এই বিশ্বের অধ্যক্ষরূপে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং ইহার নিমিত্ত এক-একটি দেবতাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সেই ঈশ্বরের আসনে বসাইতেছিলেন, ঠিক তেমনি এই স্তরে আসিয়া দেখিব, বিভিন্ন স্তোত্রে

কোন একটি তত্ত্বকে গ্রহণপূর্বক অনন্তরূপে বর্ধিত করিয়া তাহাকেই নিখিল বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; এমন কোন একটি বিশিষ্ট তত্ত্বকে এই জগতের আধার-রূপে গ্রহণ করা হইতেছে—যাহাতে এই বিশ্বের স্থিতি এবং যাহা এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে। নানা আদর্শ সম্বন্ধে এই রীতি অনুসৃত হইল। প্রাণ বা জীবনী-শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহারা এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই প্রাণতত্ত্বকে এমনভাবে বর্ধিত করিতে লাগিলেন যে, ঐ প্রাণশক্তি এক বিশ্বব্যাপী অনন্ত তত্ত্বে পরিণত হইল। এই প্রাণশক্তি সকলকে ধারণ করিতেছে—কেবল মনুষ্য-শরীরকে নয়, এই প্রাণশক্তি সূর্য ও চন্দ্রেরও আলো—ইহাই সবকিছুকে স্পন্দিত করিতেছে। ইহাই বিশ্বের প্রেরণাশক্তি।

সমস্যার সমাধানে এই-সকল চেষ্টা অতীব সুন্দর—অতিশয় কাব্যমধুর। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন 'তিনিই সুন্দরী ঊষার আগমনবার্তা ঘোষণা করেন' প্রভৃতি তাঁহারা যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব গীতিময়।

এই যে 'ইচ্ছা' , যাহা আমরা এই মাত্র পড়িলাম, যাহা সৃষ্টির আদিবীজরূপে উত্থিত হইয়াছিল, উহাকে তাঁহারা এমন ভাবে বিস্তৃত করিতে লাগিলেন যে, উহাই শেষ পর্যন্ত এক বিশ্বজনীন ঈশ্বরতত্ত্বে পরিণত হইল। কিন্তু এই ধারণাগুলির কোনটিই তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিল না।

এই ধারণা ক্রমে মহিমান্বিত হইয়া শেষে এক বিরাট ব্যক্তিত্বে ঘনীভূত হইল।

'তিনি সৃষ্টির অগ্রে ছিলেন, তিনি সব কিছুর অধীশ্বর, তিনি বিশ্বকে ধরিয়া আছেন, তিনি জীবের স্রষ্টা, তিনি বলবিধাতা, সকল দেবতা যাঁহাকে উপাসনা করেন, জীবন ও মৃত্যু যাঁহার ছায়া—তাঁহাকে ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে আমরা উপাসনা করিব? তুষারমৌলি হিমালয় যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সমুদ্র তাহার সমগ্র জলরাশির সহিত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে'—এইভাবে তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন।১৬ কিন্তু এই মাত্র আমি বলিয়াছি যে, এই সমস্ত ধারণাও তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। অবশেষে (বেদে) আমরা এক অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাই। (ঐ যুগে) আর্যমানবের মন বহিঃপ্রকৃতি হইতে

এতদিন ঐ প্রশ্নের (কে সেই সর্বজ্ঞ একমাত্র স্রষ্টা?) উত্তর অনুসন্ধান করিতেছিল। তাঁহারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাশি প্রভৃতি সর্ববস্তুর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সাধ্যানুযায়ী তাহার সমাধানও করিয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁহাদের শুধু এইটুকু শিখাইল—বিশ্বের নিয়ন্তা এক সগুণ ঈশ্বর আছেন। বহিঃপ্রকৃতি ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক শিখাইতে পারে না। সংক্ষেপে বহিঃপ্রকৃতি হইতে আমরা মাত্র একজন বিশ্ব-স্থপতির অস্তিত্ব ধারণা করিতে পারি। এই ধারণা রচনাকৌশলবাদ (Design Theory) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আমরা সকলেই জানি, এইরূপ মীমাংসা খুব বেশী যুক্তিসঙ্গত নয়; এই মতবাদ কতকটা ছেলেমানুষী, তথাপি বহির্জগতের কারণানুসন্ধান দ্বারা এইটুকু মাত্র আমরা জানিতে পারি যে, এই জগতের একজন নির্মাতা প্রয়োজন। কিন্তু ইহাদ্বারা আদৌ জগতের ব্যাখ্যা হইল না। এই জগতের উপাদান তো ঈশ্বরের আগেও ছিল এবং তাঁহার এই-সব উপাদানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইহাতে এক ভীষণ আপত্তি উঠিবে যে, তিনি তাহা হইলে এই উপাদানের দ্বারা সীমাবদ্ধ। গৃহনির্মাতা উপাদান ব্যতিরেকে গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন না। অতএব তিনি উপাদান দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেন; উপাদানের দ্বারা যতটুকু সম্ভব, ততটুকু মাত্র তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন। সেইজন্য রচনাকৌশলবাদের ঈশ্বর একজন স্থপতি মাত্র এবং সেই বিশ্বস্থপতি সসীম; উপাদানের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ—একেবারেই স্বাধীন নন। এই পর্যন্ত তাঁহারা ইতঃপূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বহু মানবচিত্ত এইখানেই বিশ্রাম করিতে পারে। অন্যান্য দেশের চিন্তাক্ষেত্রে এইরূপই ঘটিয়াছিল; মনুষ্যমন উহাতে তৃপ্ত হইতে পারে নাই; চিন্তাশীল, অবধারণশীল চিত্ত আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহিল; যদিও যাহারা পশ্চাদ্‌বর্তী তাহারা উহাই ধরিয়া রহিল এবং অগ্রবর্তীদের আর অগ্রসর হইতে দিল না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এই হিন্দু ঋষিরা আঘাত খাইয়া দমিবার পাত্র ছিলেন না; তাঁহারা ইহার সমাধান চাহিলেন এবং এখন আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহারা বাহ্যকে ত্যাগ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছেন।

প্রথমেই তাঁহাদের মনে এই সত্য ধরা পড়িয়াছিল যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করি না বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারি না; তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা সেইজন্য আমাদের শারীরিক এবং মানসিক অক্ষমতা নির্দেশ করা, ইহা

আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। একজন ঋষি বলিলেন, 'তুমি এই বিশ্বের কারণ জান না; তোমার ও আমার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে—কেন? তুমি ইন্দ্রিয়পর বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিতেছ, এবং বিষয় ও ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে সন্তুষ্ট রহিয়াছ, পক্ষান্তরে আমি ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষকে জানিয়াছি।'

আমি যে আধ্যাত্মিক প্রগতির অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অপর দিক্—যাহার সহিত আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যেজন্য আমি উহা বিশদরূপে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক নই—সেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের বৃদ্ধির সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব। যদি আধ্যাত্মিক ধারণার প্রগতি সমান্তরে (Arithmetical Progression) বর্ধিত হয়, তাহা হইলে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রগতি সমগুণিতান্তর (Geometrical Progression) বেগে বর্ধিত হইয়াছে—প্রাচীন কুসংস্কার এক বিরাট আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে; ইহা ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করিয়া হিন্দুর জীবনীশক্তিকে নিজের চাপে প্রায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছে; ইহা এখনও সেখানে বর্তমান; ইহা আমাদিগকে কঠোরভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং আমাদের জীবনীশক্তির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া জন্ম হইতে আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। তথাপি সেই প্রাচীনকাল হইতেই আমরা দেখিতে পাই, অনুষ্ঠানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধও চলিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে যে একটি আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহা এই—ক্রিয়াকাণ্ডে প্রীতি, নির্দিষ্ট সময়ে পরিচ্ছদ ধারণ, নির্দিষ্ট উপায়ে খাওয়া-দাওয়া—ধর্মের এই-সব বাহ্য ঘটা ও মূক নাট্যাভিনয়গুলি হইল বহিরঙ্গ ধর্ম; ইহা কেবল মানুষের ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে, মানুষকে ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে যাইতে দেয় না; আমাদের এবং প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হওয়ার পথে ইহা প্রচণ্ড বাধা।

পারতপক্ষে আমরা যদি বা আধ্যাত্মিক বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাও ইন্দ্রিয়ের উপযোগী হওয়া চাই; একজন মানুষ কয়েকদিন ধরিয়া দর্শন, ঈশ্বর, অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্বন্ধে শ্রবণ করার পর জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বেশ, এতে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে? ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ এতে কতটুকু হয়?' সম্ভোগ বলিতে ইহারা মাত্র ইন্দ্রিয়সুখই বুঝে—ইহা

খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের ঋষিরা বলিতেছেন, ‘ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই আমাদের ও সত্যের মধ্যে এক আবরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।’ ক্রিয়াকাণ্ডে আনন্দ, ইন্দ্রিয়ে তৃপ্তি এবং বিভিন্ন মতবাদ আমাদের ও সত্যের মধ্যে এক আবরণ টানিয়া দিয়াছে। এই বিষয়টি আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর এক বিরাট সীমা-নির্দেশ। আমরা শেষ পর্যন্ত এই আদর্শেরই অনুসরণ করিব এবং দেখিতে পাইব, ইহা কিরূপে বর্ধিত হইয়া বেদান্তের সেই অদ্ভুত মায়াবাদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে—এই মায়ার অবগুণ্ঠনই বেদান্তের যথার্থ ব্যাখ্যা—সত্য চিরকালই সমভাবে বিদ্যমান, কেবল মায়া তাহার অবগুণ্ঠনের দ্বারা তাহাকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন চিন্তাশীল আর্যেরা এক নূতন প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন, বহির্জগতের অনুসন্ধানের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে না। অনন্তকাল ধরিয়া বহির্জগতে অনুসন্ধান করিলেও সেখান হইতে এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যাইবে না। এইজন্য তাঁহারা অপর পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন এবং তদনুসারে জানিলেন যে, এই ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা, ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি আসক্তি, বাহ্য বিষয়ই ব্যক্তির সহিত সত্যের মিলনের মধ্যে এক ব্যবধান টানিয়া দিয়াছে, যাহা কোন ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা অপসারিত হইবার নয়। তাঁহারা তাঁহাদের মনোজগতে আশ্রয় লইলেন এবং নিজেদেরই মধ্যে সেই সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য মনকে বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বহির্জগতে ব্যর্থ হইয়া যখন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিলেন, তখনই ইহা প্রকৃত বেদান্তদর্শনে পরিণত হইল; এখান হইতেই বেদান্তদর্শনের আরম্ভ এবং ইহাই বেদান্তের ভিত্তি-প্রস্তর। আমরা যতই অগ্রসর হইব, ততই বুঝিতে পারিব, এই দর্শনের সকল অনুসন্ধান অন্তর্দেশে। দেখা যায়—একেবারে প্রথম হইতেই তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন, ‘কোন ধর্মবিশেষে সত্যের অনুসন্ধান করিও না; সকল রহস্যের রহস্য, সকল জ্ঞানের কেন্দ্র, সকল অস্তিত্বের খনি—এই মানবাত্মায় অনুসন্ধান কর। যাহা এখানে নাই, তাহা সেখানেও নাই।’ ক্রমে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, যাহা বাহ্য তাহা অন্তরের বড়জোর একটা মলিন প্রতিবিম্ব মাত্র। আমরা দেখিতে পাইব, তাঁহারা কেমন করিয়া জগৎ হইতে পৃথক্ এবং শাসক ঈশ্বরের প্রাচীন ধারণাকে প্রথম বহির্দেশ হইতে অন্তরে স্থাপন

করিয়াছেন। এই ভগবান্ জগতের বাহিরে নন, অন্তরে; এবং পরে সেখান হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়া তাঁহারা নিজেদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি এখানে—এই মানব-হৃদয়ে আছেন—তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের অন্তর্যামী সত্যস্বরূপ।

বেদান্ত-দর্শনের কর্মপ্রণালী যথাযথভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে কতকগুলি মহৎ ধারণা পূর্বে বুঝিতে হইবে। ক্যাণ্ট ও হেগেলের দর্শন আমরা যেভাবে বুঝি, বেদান্ত সেই ভাবের কোন দর্শনশাস্ত্র নয়। ইহা কোন গ্রন্থ-বিশেষ বা কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের লেখা নয়। বেদান্ত হইতেছে—বিভিন্ন কালে রচিত গ্রন্থসমষ্টি। কখনও কখনও দেখা যায়, ইহার একখানিতেই পঞ্চাশটি বিষয়ের সন্নিবেশ। অপর বিষয়গুলি যথাযথভাবে সজ্জিতও নয়; মাত্র চিন্তাগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই নানা বিজাতীয় বিষয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট। কিন্তু একটা বিষয় খুব প্রণিধানযোগ্য যে, উপনিষদের এই আদর্শগুলি চির-প্রগতিশীল। ঋষিগণের মনের কার্যাবলী যেমন যেমন চলিয়াছে, তাঁহারাও সেই প্রাচীন অসম্পূর্ণ ভাষায় উহা তেমনি তেমনি আঁকিয়াছেন। প্রথম ধারণাগুলি অতি স্থূল, ক্রমে সেগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ধারণায় পরিণত হইয়া বেদান্তের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে এবং পরে এই শেষ সিদ্ধান্ত এক দার্শনিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন প্রথম আমরা দেখিতে পাই—দ্যোতন-স্বভাব দেবতার অনুসন্ধান, তারপর আদি জগৎ-কারণের অন্বেষণ এবং সেই সত্য একই অনুসন্ধানের ফলে আর একটি অধিকতর স্পষ্ট দার্শনিক আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে, সকল পদার্থের একত্ব—'যাঁহাকে জানিলে সকলই জানা হয়।'

৮. হিন্দুধর্ম

[প্রাচীন বৈদিক ঋষিদেরই প্রেম ও পরধর্মসহিষ্ণুতাপূর্ণ মধুর কণ্ঠস্বর সেদিন হিন্দু সন্ন্যাসী পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল; এবং ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটির নিমন্ত্রণক্রমে যাঁহারা ক্লিণ্টন এভেন্যুতে অবস্থিত পাউচ্ গ্যালারীর প্রকাণ্ড বক্তৃতাগৃহ এবং তৎসংযুক্ত গৃহগুলিতে যত লোক ধরে, তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন, সেই বহু শত শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যেককে সেই কণ্ঠস্বরই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।—৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খ্রীঃ।

এই প্রাচ্য সন্ন্যাসী 'হিন্দুধর্ম'-নামক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দর্শনসম্মত ধর্মোপাসনার দূত ও প্রতিভূরূপে প্রতীচ্যে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহার যশ পূর্ব হইতেই বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলস্বরূপ চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী, বিচারক, শিক্ষক প্রভৃতি সকল বিভাগের লোক বহু ভদ্রমহিলার সহিত শহরের নানাস্থান হইতে ভারতীয় ধর্মের এই অপূর্ব, সুন্দর ও বাগ্মিতাপূর্ণ সমর্থন শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বেই তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, তিনি চিকাগো বিশ্বমেলার অন্তর্গত ধর্মমহাসভায় কৃষ্ণ, ব্রহ্ম এবং বুদ্ধের উপাসকদের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন এবং সেখানে অখ্রীষ্টান প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই পড়িয়াছিলেন যে, এই দার্শনিক ধর্মের নিমিত্ত তিনি তাঁহার উজ্জ্বল সাংসারিক জীবন ত্যাগ করেন এবং বহু বর্ষের আগ্রহপূর্ণ এবং ধীর অধ্যয়নের ফলে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কৃষ্টিকে আয়ত্ত করিয়া ঐতিহ্যপূর্ণ হিন্দুসভ্যতার অধ্যাত্ম-রহস্যপূর্ণ ভূমিতে উহা রোপণ করেন; তাঁহারা ইতঃপূর্বে তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বাগ্মিতা, পবিত্রতা, সারল্য ও সাধুতা সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, তাই তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন।

এ-বিষয়ে তাঁহারা হতাশও হন নাই। স্বামী (রাব্বি বা আচার্য) বিবেকানন্দ তাঁহার যশ অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি যখন উজ্জ্বল লালরঙের আলখাল্লা পরিধান করিয়া সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন একগুচ্ছ কৃষ্ণ চূর্ণকুন্তল তাঁহার কমলারঙের বহুভাঁজযুক্ত

পাগড়ির পাশ দিয়া দেখা যাইতেছিল, মুখমণ্ডলের শ্যামশ্রীতে চিন্তার ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, আয়ত ভাবদ্যোতক চক্ষু ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের উদ্দীপনায় ভাস্বর এবং তাঁহার সাবলীল মুখ হইতে গভীর সুমধুর স্বরে প্রায়-নিখুঁত শুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় শুধু প্রেম, সহানুভূতি ও পরমতসহিষ্ণুতার বাণী উচ্চারিত হইতেছিল। তিনি ছিলেন হিমালয়ের প্রসিদ্ধ ঋষিদের এক অত্যাশ্চর্য প্রতিরূপ, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিকতার সহিত খ্রীষ্টধর্মের নৈতিকতার সমন্বয়কারী এক নবীন ধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার শ্রোতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিন্দুধর্মের সমর্থনকল্পে তিনি যে মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কেন শুধু সেইজন্য তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসীদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রকাশ্যভাবে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা নগরীতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর এক মহতী জনসভা আহূত হইয়াছিল। স্বামীজী লিখিত বক্তৃতা না দিয়া মৌখিক ভাষণ দিয়াছিলেন; বক্তৃতা সম্বন্ধে যে যাহাই সমালোচনা করুক না কেন, বাস্তবিকই উহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এথিক্যাল এসোসিয়েশনের-এর সভাপতি ডঃ লুইস্ জি. জেন্স্ স্বামীজীর পরিচয় দিবার পর শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাকে যে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপঃ]

শিক্ষালাভ করাই আমার ধর্ম। আমি আমার ধর্মগ্রন্থ তোমাদের বাইবেলের আলোকে অধিকতর স্পষ্টরূপে পড়ি; তোমাদের ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষের বাণীর সহিত তুলনা করিলে আমার ধর্মের অস্পষ্ট সত্য-সকল অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য চিরকালই সর্বজনীন। যদি তোমাদের সকলের হাতে মাত্র পাঁচটি আঙুল থাকে এবং আমার হাতে থাকে ছয়টি, তাহা হইলে তোমরা কেহই মনে করিবে না যে, আমার হাতখানা প্রকৃতির যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে; বরং ইহা অস্বাভাবিক এবং রোগপ্রসূত। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা।

যদি একটিমাত্র সম্প্রদায় সত্য হয় এবং অপরগুলি অসত্য হয়, তবে তোমার বলিবার অধিকার আছে, ঐ পূর্বের ধর্মটি ভুল। যদি একটি ধর্ম সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে

হইবে—অপরগুলিও নিশ্চয়ই সত্য। এই দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের উপর তোমাদের ঠিক ততখানি দাবী আছে, যতখানি আছে আমার। ঊনত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ খ্রীষ্টান, ৬ কোটি মুসলমান এবং বাকী সব হিন্দু।

প্রাচীন বেদের উপর হিন্দুরা তাহাদের ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; 'বেদ' শব্দটি জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদ কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টি; আমাদের মতে ইহাতেই সর্বধর্মের সার নিহিত; তবে এ-কথা আমরা বলি না যে, সত্য কেবল ইহাতেই নিহিত আছে। বেদ আমাদিগকে আত্মার অমরত্ব শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা এক স্থায়ী সাম্য-অবস্থার সন্ধান করা, যাহা কখনও পরিবর্তিত হয় না। প্রকৃতিতে আমরা ইহার সাক্ষাৎ পাই না, কারণ সমগ্র বিশ্ব এক অসীম পরিবর্তনের সমষ্টি ব্যতীত কিছুই নয়।

কিন্তু ইহা হইতে যদি এইরূপ অনুমান করা হয় যে, এই জগতে অপরিবর্তনীয় কিছুই নাই, তবে আমরা হীনযান বৌদ্ধ এবং চার্বাকদের ভ্রমেই পতিত হইব। চার্বাকেরা বিশ্বাস করে, সব কিছুই জড়। মন বলিয়া কিছুই নাই, ধর্মমাত্রই প্রবঞ্চনা এবং নৈতিকতা ও সততা অপ্রয়োজনীয় কুসংস্কার। বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেয়, মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়বর্গ বর্তমানই জানিতে পারে, ভবিষ্যৎ বা অতীত পারে না; কিন্তু এই বর্তমান যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যতের সাক্ষ্য দেয় এবং ঐ তিনটিই যেহেতু কালের বিভিন্ন নির্দেশ মাত্র, অতএব যদি ইন্দ্রিয়াতীত, কাল-নিরপেক্ষ এবং অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ঐক্যবিধানকারী কোন সত্তা না থাকে, তাহা হইলে বর্তমানও অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু স্বাধীন কে? দেহ স্বাধীন নয়; কারণ ইহা বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, মনও স্বাধীন নয়, কারণ যে চিন্তারাশি দ্বারা ইহা গঠিত, তাহাও অপর এক কারণের কার্য। আমাদের আত্মাই স্বাধীন। বেদ বলেন, সমগ্র বিশ্ব, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা—মুক্তি ও দাসত্বের মিশ্রণে প্রস্তুত। কিন্তু এই-সকল দ্বন্দ্বের মধ্যেও সেই মুক্তি, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও পবিত্র আত্মা প্রকাশিত আছেন। যদি ইহা স্বাধীন হয়, তাহা হইলে ইহার ধ্বংস সম্ভব নয়; কারণ মৃত্যু একটা পরিবর্তন এবং একটা বিশেষ অবস্থা-সাপেক্ষ। আত্মা যদি স্বাধীন হয়,

ইহাকে পূর্ণ হইতেই হইবে। কারণ—অসম্পূর্ণতাও একটা অবস্থা-সাপেক্ষ, সেইজন্য উহা পরাধীন। আবার এই অমর পূর্ণ আত্মা নিশ্চয়ই সর্বোত্তম, ভগবান্ হইতে নিকৃষ্ট মানবে পর্যন্ত সকলের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত; উভয়ের প্রভেদ মাত্র আত্মার বিকাশের তারতম্যে। কিন্তু আত্মা শরীর ধারণ করে কেন? যে কারণে আমি আয়না ব্যবহার করি নিজের মুখ দেখিবার জন্য—এইভাবেই দেহে আত্মা প্রতিবিম্বিত হন। আত্মাই ঈশ্বর; প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই পূর্ণ দেবত্ব রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশ করিতেই হইবে। যদি আমি কোন অন্ধকার গৃহে থাকি, সহস্র অনুযোগেও ঘর আলোকিত হইবে না; আমাকে দীপ জ্বালিতেই হইবে। ঠিক তেমনি, শুধু অনুযোগ বা আর্তনাদের দ্বারা আমাদের অপূর্ণ দেহ কখনও পূর্ণতা লাভ করিবে না; কিন্তু বেদান্ত শিক্ষা দেয়, তোমার আত্মার শক্তিকে উদ্বোধিত কর—নিজ দেবত্ব প্রকাশিত কর। তোমার বালক-বালিকাদের শিক্ষা দাও যে, তাহারা দেবতা; ধর্ম অস্তিমূলক, নাস্তিমূলক বাতুলতা নয়; পীড়নের ফলে ক্রন্দনের আশ্রয় লওয়াকে ধর্ম বলে না—ধর্ম বিস্তার ও প্রকাশ।

প্রত্যেক ধর্মই বলে, অতীতের দ্বারাই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপায়িত হয়; বর্তমান অতীতের ফলস্বরূপ। তাহাই যদি হইল, তবে প্রত্যেক শিশু যখন এমন কতকগুলি সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহার ব্যাখ্যা বংশানুক্রমিক ভাব-সংক্রমণের সাহায্যে দেওয়া চলে না, তাহার কি মীমাংসা হইবে? কেহ যখন ভাল পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎ শিক্ষার দ্বারা সৎ লোক হয় এবং অপর কেহ নীতিজ্ঞানশূন্য পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে জীবনলীলা শেষ করে, তাহারই বা কি ব্যাখ্যা হইবে? ঈশ্বরকে দায়ী না করিয়া এই বৈষম্যের সমাধান কি করিয়া সম্ভব? করুণাময় পিতা তাঁহার সন্তানকে কেন এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করিলেন, যাহার ফল নিশ্চিত দুঃখ? 'ভগবান্ ভবিষ্যতে সংশোধন করিবেন—প্রথমে হত্যা করিয়া পরে ক্ষতিপূরণ করিবেন'—ইহা কোন ব্যাখ্যাই নয়; আবার ইহাই যদি আমার প্রথম জন্ম হয়, তবে আমার মুক্তির কি হইবে? পূর্বজন্মের সংস্কার-বর্জিত হইয়া সংসারে আগমন করিলে স্বাধীনতা বলিয়া আর কিছুই থাকে না, কারণ আমার পথ তখন অপরের অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্দেশিত হইবে। আমি যদি আমার

ভাগ্যের বিধাতা না হই, তাহা হইলে আমি আর স্বাধীন কোথায়? বর্তমান জীবনের দুঃখের দায়িত্ব আমি নিজেই স্বীকার করি, এবং পূর্বজন্মে যে অন্যায় বা অশুভ কর্ম করিয়াছি, এই জন্মে আমি নিজেই তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিব। আমাদের জন্মান্তরবাদের দার্শনিক ভিত্তি এইরূপ। আমরা পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা লইয়া বর্তমান জীবনে প্রবেশ করিয়াছি এবং আমাদের বর্তমান জন্মের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য সেই পূর্বজন্মের কর্মের ফল; তবে উত্তরোত্তর আমাদের উন্নতিই হইতেছে এবং অবশেষে একদিন আমরা পূর্ণত্ব লাভ করিব।

বিশ্বজগতের পিতা, অনন্ত সর্বশক্তিমান্ এক ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের আত্মা যদি অবশেষে পূর্ণতা লাভ করে, তবে তখন তাহাকে অনন্তও হইতে হইবে। কিন্তু একই কালে দুইটি নিরপেক্ষ অনন্ত সত্তা থাকিতে পারে না; অতএব আমরা বলি যে, তিনি ও আমরা এক। প্রত্যেক ধর্মই এই তিনটি স্তর স্বীকার করে। প্রথমে আমরা ঈশ্বরকে কোন দূরদেশে অবস্থান করিতে দেখি, ক্রমে আমরা তাঁহার নিকটবর্তী হই এবং তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করি, অর্থাৎ আমরা তাঁহাতেই আশ্রিত আছি, মনে করি; সর্বশেষে জানি যে, আমরা ও তিনি অভিন্ন। ভেদদৃষ্টিতে যে ভগবানের দর্শন, তাহাও মিথ্যা নয়; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে যত ধারণা আছে, সবই সত্য, এবং তাই প্রত্যেক ধর্মও সত্য; কারণ উহারা আমাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তর; সকলেরই উদ্দেশ্য বেদের সম্পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা। কাজেই আমরা হিন্দুরা কেবল পরমতসহিষ্ণু নই, আমরা প্রত্যেক ধর্মকে সত্য বলিয়া মানি এবং তাই মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, জরথুষ্ট্রীয়দের অগ্নির সমক্ষে উপাসনা করি, খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সমক্ষে মাথা নত করি, কারণ আমরা জানি, বৃক্ষ-প্রস্তরের উপাসনা হইতে সর্বোচ্চ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ পর্যন্ত প্রত্যেক মতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানবাত্মা নিজ জন্ম ও আবেষ্টনীর পরিপ্রেক্ষিতে অনন্তকে ধরিবার ও বুঝিবার জন্য ঐরূপ বিবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত আছে; প্রত্যেক অবস্থাই আত্মার প্রগতির এক-একটি স্তর মাত্র। আমরা এই বিভিন্ন পুষ্পগুলি চয়ন করি এবং প্রেমসূত্রে বন্ধন করিয়া এক অপূর্ব উপাসনা-স্তবকে পরিণত করি।

আমি যদি ব্রহ্মই হই, তাহা হইলে আমার অন্তরাত্মাই সেই পরমাত্মার মন্দির এবং আমার প্রত্যেক কর্মই তাঁহার উপাসনা হওয়া উচিত। আমাকে—পুরস্কারের আশা বা শাস্তির ভয় না রাখিয়া ভালবাসার জন্যই ভালবাসিতে হইবে। কর্তব্যবোধেই কর্ম করিতে হইবে। এইভাবে আমার ধর্মের অর্থ বিস্তার, বিস্তার অর্থে অনুভূতি অর্থাৎ সর্বোচ্চভাবের উপলব্ধি—বিড়বিড় করিয়া কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করা বা হাঁটুগাড়ার ভঙ্গিমা নয়। মানুষকে দেবত্ব লাভ করিতে হইবে—প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতররূপে সেই দেবত্বের উপলব্ধি করিতে করিতে অনন্ত প্রগতির পথে চলিতে হইবে।

[বক্তৃতাকালে বক্তাকে মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনি সহকারে আন্তরিক অভিনন্দন জানান হইতেছিল। বক্তৃতান্তে তিনি প্রায় পনর মিনিট কাল প্রশ্নোত্তরদানে কাটান। অতঃপর তিনি সাধারণভাবে অনেকেরই সহিত মেলামেশা করিয়াছিলেন।—ব্রুকলিন স্টাণ্ডার্ড (The Brooklyn Standard)]